কমরেড প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের জীবনাবসান

রাজ্য সরকারী কর্মচারী তথা মধ্যবিত্ত অংশের আন্দোলনের দীর্ঘদিনের নেতৃত্ব, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক কমরেড প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের জীবনাবসান ঘটেছে বিগত ২৪ জানুয়ারি '২৫ সন্ধ্যা ৫.৪৫ মিনিটে কলকাতার একটি বেসরকারী হাসপাতালে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত ওয়েস্ট বেঙ্গল সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস এসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি স্নায়ুরোগে ভুগছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলনে একটা শূন্যতা সৃষ্টি হল। মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই শোকের ছায়া নেমে আসে কর্মচারী মহলে। হাসপাতালে গিয়ে তাঁর শবদেহে মাল্যদান করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি মানস দাস, সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায়, প্রবীণ নেতৃত্ব প্রবীর মুখার্জী, এস ই এস এ সমিতির সাধারণ সম্পাদক মনিশংকর মণ্ডল, গণআন্দোলনের নেতা পলাশ দাস প্রমুখ। ওইদিন রাতেই দক্ষিণ কলকাতার সিরিটি শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী, দুই পুত্র, দুই পুত্রবধূ এবং এক নাতনী বর্তমান।

১৯৪৭ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি নদীয়া জেলার মুড়াগাছায় এক সম্পন্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে কমরেড প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম। তাঁর বাবা নিত্যরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একজন কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী। চার ভাই এক বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। মুড়াগাছার বিদ্যালয়ে স্কুল শিক্ষা শেষ করে কলকাতার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ পলিটেকটিক কলেজে ভর্তি হয়ে তিনি ১৯৬৮ সালে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপ্লোমা লাভ করেন। কলেজে পাঠরত অবস্থায় রাজ্যের তীব্র গণ আন্দোলনের উত্তাপে তিনি সেই সময়কার ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত হন এবং ক্রমে শ্রমজীবীদের মতাদর্শের প্রতি আকর্ষণ পরবর্তীতে এই শ্রেণী আদর্শই তাঁর জীবনধারার আলোকবর্তিকা হয়ে ওঠে।

বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকের একেবারে শেষের দিকে ১৯৬৯ সালে কমরেড চট্টোপাধ্যায় রাজ্য সরকারের সেচ ও জলপথ দপ্তরের অধীন কংসাবতী বাঁধ প্রকল্পে বাঁকুড়া জেলার প্রত্যন্ত এলাকা খাতড়াতে অবস্থিত মেকানিক্যাল- ইলেকট্রিক্যাল ডিভিশনে একজন সাব এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার (মেকানিক্যাল) হিসাবে চাকরিতে যোগ দিয়েই নিজ সমিতির দৈনন্দিন কাজে নিজেকে যুক্ত করেন। সেই সময়ে রাজ্যের তৎকালীন তুমুল গণ আন্দোলনের আঁচ প্রসারিত হয়েছিল কর্মচারী আন্দোলনেও। সাথে ছিল বিভেদের তৎপরতা। ফলে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও বিভেদ—এই ত্রিমুখী আক্রমণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমিতির আন্দোলনের পাশাপাশি সমগ্র কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার মধ্য দিয়ে কমরেড প্রণব চট্টোপাধ্যায় কর্মচারী সমাজে নেতৃত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠা পান। জরুরী অবস্থাকালে আক্রমণের হুমকি তাঁকে আন্দোলন থেকে দূরে রাখতে পারেনি।

রাজ্য গণ আন্দোলনের শীর্ষ তরঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পরবর্তীতে তাঁর চাকুরিস্থল কলকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর ১৯৮০ সালে কৃষ্ণনগর সম্মেলনে নিজ সমিতির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যপদ

অর্জন ও ১৯৮১ সালেই সিউড়িতে অনুষ্ঠিত সমিতির ৩১-৩২তম বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন থেকে তিনি সমিতির যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন এবং ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত সেই দায়িত্ব তিনি পালন করেন।

এই একই সময়ে কমরেড প্রণব চট্টোপাধ্যায় প্রথমে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কলকাতা উত্তরাঞ্চলের যুগ্ম সম্পাদক ও পরে লবণহ্রদ অঞ্চলের সম্পাদক হিসাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই দ্বিবিধ দায়িত্ব পালনের কার্যকালেই তাঁর মধ্যে বৃহত্তর পরিসরে অধ্যয়ন, দেশ-বিদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ ও সে সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ ও তার যথাযথ প্রয়োগ, অনুকরণীয় বাগ্মীতার অনুশীলনের মধ্য দিয়ে প্রচার বিজ্ঞানের কৌশল আয়ত্ত করে মানুষের মনে শাসকশ্রেণী বিরোধী মনোভাব সঞ্চারিত করার বহুমুখী যোগ্যতা ও গুণাবলীর বিকাশ ঘটে।

কমরেড প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের গুণাবলীর অন্যতম দিক ছিল তাঁর লেখনী; যুক্তি ও তথ্যের উপস্থাপনার শৈলীতে তা ছিল ক্ষুরধার। প্রথমে সমিতির প্রচার উপসমিতির প্রথম আহ্বায়ক হিসাবে 'নিউজ বুলেটিন' প্রকাশনার সময় থেকে শুরু করে সমিতির প্রধান মুখপত্র 'সংযোগ'-এর প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও নিবন্ধে অর্থনীতি, সাম্প্রদায়িকতা, ট্রেড ইউনিয়ন, নয়া ফ্যাসিবাদ, বাজেট বিশ্লেষণ, আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী, বিভেদ ইত্যাদি বহু বিষয়ে তাঁর রচনা কর্মচারী আন্দোলনকে পুষ্ট করেছে।

কর্মচারী আন্দোলনের সমস্ত মুখপত্রের পরিসর ছাড়িয়ে তাঁর রচনা প্রকাশ পেয়েছে সব ধরনের শ্রমিক-কর্মচারী সংগঠনের মুখপত্রসমূহে। ১৯৮০ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত 'সংযোগ' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসাবে তিনি যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে লেখা তাঁর কিছু প্রবন্ধ ও নিবন্ধ পুস্তিকাকারেও প্রকাশিত হয়েছে। দেশে উদার অর্থনীতির আগমনের প্রামাণ্য দলিল 'মারাকাস থেকে সিয়াটেল' পুস্তকটির যুগ্ম লেখক হিসাবে ছিলেন প্রণব চট্টোপাধ্যায় ও শুভাশীষ গুপ্ত।

এইসব বহুমুখী গুণাবলী ও যোগ্যতাই তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছে মুখপত্র প্রকাশনা ও সাংবাদিকতার সরণীতে। বিগত শতাব্দীর নয়ের দশকে কর্মচারী আন্দোলনের মুখপত্র হিসাবে 'সংগ্রামী হাতিয়ার' যখন দেশের সর্বাধিক প্রচারিত ট্রেড ইউনিয়ন মুখপত্রের তকমা লাভ করে, ১৯৯২ সালের সেই সন্ধিক্ষণেই কমরেড প্রণব চট্টোপাধ্যায় 'সংগ্রামী হাতিয়ার'-এর সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং ২০০৭ সাল পর্যন্ত সেই দায়িত্ব যোগ্যতার সাথে পালন করেন। যদিও ১৯৯০ সাল থেকে অন্যতম সহযোগী সম্পাদক হিসাবে 'সংগ্রামী হাতিয়ার' প্রকাশনার দায়িত্বে তিনি যুক্ত ছিলেন।

কমরেড প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের যাত্রাপথ বিগত চার দশক ধরে কখনোই শুধুমাত্র কর্মচারী আন্দোলনের পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বিগত শতাব্দীর ষাট ও সত্তর দশকের মিলন মুহূর্ত থেকেই তিনি সমাজ পরিবর্তন তথা বিপ্লবী সাম্যবাদী আন্দোলনের মতাদর্শে প্রথমে আকর্ষিত ও পরবর্তীতে দীক্ষিত হয়ে ওঠেন। ফলে এই রাজ্যের প্রগতিশীল আন্দোলনের মূলধারা—যা ছাত্র, যুব মহিলা, শ্রমিক, কৃষক, মজদুর শ্রেণীর আন্দোলনের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে, তাঁদের কমরেড প্রণব চট্টোপাধ্যায়কে চিনে নিতে, নেতৃত্বে বরণ করে নিতে ভুল করেনি। ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চাকরি থেকে অবসরের পর রাজ্যব্যাপী কর্মচারী আন্দোলনের শীর্ষ নেতৃত্ব প্রদানের পাশাপাশি বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। বিশেষ করে ২০১০ সাল থেকে এই রাজ্যে 'পরিবর্তন'-এর নামে প্রতিক্রিয়ার শক্তি কর্তৃক নৈরাজ্যমূলক প্রতিবিপ্লবী ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড ও বিশেষত ২০১১ সালের নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে কর্মচারী সংগঠনের উপর সরাসরি প্রশাসনিক তীব্র আক্রমণের মধ্যেও কর্মচারী সংগঠন ও আন্দোলনকে জারি রাখার শ্রমসাধ্য, সাহসী ও দায়বদ্ধ ভূমিকা পালন করেন কমরেড চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বহুমুখী মেধার কারণেই রাজ্যের গণতান্ত্রিক তথা সাম্যবাদী আন্দোলনের অন্যতম সাপ্তাহিক পত্রিকা 'দেশহিতৈষী' কমরেড প্রণব চট্টোপাধ্যায়কে সম্পাদক হিসাবে মনোনীত করে এবং ২০১৮ থেকে ২০২২ সালে অসুস্থতার আগে পর্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে সে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। বেশ কিছুকাল আগে থেকেই অবশ্য তিনি এই পত্রিকার লেখক হিসাবে যুক্ত ছিলেন।

পরবর্তীকালে জটিল স্নায়ুতন্ত্রের রোগে আক্রান্ত হওয়ায় ২০২৪ সালের শেষভাগ থেকে ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত তাঁকে যুগপৎ হাসপাতাল ও বাড়িতে চিকিৎসিত হতে হয়। কমরেড প্রণব চট্টোপাধ্যায়-এর নাম তাঁর মতাদর্শের প্রতি দায়বদ্ধতা, সাংগঠনিক যোগ্যতা, বহুমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনার দক্ষতা, উদ্দীপক প্রচার কার্য পরিচালন, মুখপত্র প্রকাশনা ও পরিচালনার সাফল্যের কারণে কর্মচারী আন্দোলন তথা সামগ্রিক গণ আন্দোলনের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। □

বিদ্যুৎক্ষেত্রে আন্দোলন দমনে এসমা জারি চণ্ডীগড়, উত্তরপ্রদেশে তীব্র প্রতিবাদ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির

মোদী তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় আসার পর আর এস এস তথা সংঘ পরিবারের হিন্দুত্ববাদী আক্রমণ যেমন তীব্র মাত্রা নিয়েছে, ঠিক তেমনি আদানিদের বন্ধু মোদী সরকার ও বিজেপি পরিচালিত রাজ্যগুলি বিদ্যুৎ ক্ষেত্র সহ রাষ্ট্রায়ত্ত অন্যান্য ক্ষেত্রগুলি বেসরকারীকরণের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রশাসিত চণ্ডীগড়, উত্তরপ্রদেশ, তেলেঙ্গানায় রাষ্ট্রায়ত্ত বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে বেপরোয়া বেসরকারীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ ক্ষেত্র বেসরকারীকরণের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে স্মার্ট মিটারকে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের জমি বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে।

চণ্ডীগড়ে এই ধরনের উদ্যোগের বিরুদ্ধে সেই ক্ষেত্রের কর্মচারীরা ব্যাপক আন্দোলন শুরু করেন। ভীত সন্ত্রস্ত কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে এসমা জারি করে প্রশাসন ৫ ডিসেম্বর '২৫ রাত থেকে। ৬ ডিসেম্বর চণ্ডীগড় পাওয়ার ওয়ার্কমেন সারাদিন ব্যাপী ধর্না আন্দোলন চালায়। সংগ্রাম জারি আছে।

একইভাবে উত্তরপ্রদেশের ডাবল ইঞ্জিন যোগী সরকার মূলত আগ্রা ও বারাণসীতে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের উপর ব্যাপক আগ্রাসন নামিয়ে আনে। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের তীব্র প্রতিবাদে ভীত যোগী সরকার অযোধ্যায় গিয়ে রামের শরণ না নিয়ে এসমাকে হাতিয়ার করেছে।

৬ ডিসেম্বর থেকে উত্তরপ্রদেশের সরকারী ও রাষ্ট্রায়ত্ত সমস্ত ক্ষেত্রে এসমা জারি হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছেন সেখানকার রাজ্য সরকারী কর্মচারীবৃন্দ। ৭ ডিসেম্বর থেকে সেখানে দৃঢ়পণ সংগ্রাম শুরু হয়েছে। রাজ্য সরকারী কর্মচারী সহ অন্যান্য সকল অংশের মানুষ বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের উপর এই ভয়ঙ্কর আক্রমণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হয়েছে। ১৩ ডিসেম্বর "জাতীয় বেসরকারীকরণ বিরোধী দিবস" এই পরিপ্রেক্ষিতে অন্য মাত্রা নেয়।

এই রাজ্যের রাজ্য সরকারী কর্মচারীরাও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে এই অনৈতিক এসমা জারির বিরুদ্ধে তাঁদের সংহতি জানিয়েছেন। প্রতিটি দপ্তরে টিফিন বিরতিতে বিক্ষোভ সভা হয় একে কেন্দ্র করে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে একে কেন্দ্র করে দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে—"... একদিকে সংখ্যালঘু বিদ্বেষ অপর দিকে সরকারী কর্মচারীদের অধিকারের ওপর আক্রমণ—কর্পোরেট কমিউনাল নেক্সাসের ভিত্তিতে পরিচালিত সরকারের মুখোশ খুলে দিয়েছে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি অবিলম্বে 'এসমা' প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছে এবং যোগী সরকারের এই স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পশ্চিমবাংলার কর্মচারীদের প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।" □

সংগ্রামী হাতিয়ার

নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৪

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

বাহান্নতম বর্ষ □ সপ্তম-অষ্টম সংখ্যা □ মূল্য ঃ ৪ টাকা

সম্পাদকীয়

শ্রমকোড—তীব্র সংগ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছে শ্রমজীবী মানুষ

নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের এন ডি এ সরকার উপর্যুপরি তৃতীয় বার দেশ পরিচালনা করছে। এই সরকারে বিগত দু'দফার মতো বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়, সাঙ্গপাঙ্গদের উপর অনেকটাই নির্ভরশীল। এতদ্‌সত্ত্বেও তৃতীয় দফায় ক্ষমতায় এসে বিজেপি একইরকম বেপরোয়া তার নিজস্ব নীতি প্রণয়নের বিষয়ে। আর এস এস-এর হিন্দুত্ববাদী নীতির প্রয়োগই হোক বা কর্পোরেট তোষণকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রেই হোক—মোদী সরকার অতীতের মতোই কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করার প্রবণতা দেখাচ্ছে। এরকম গা-জোয়ারি ভাব দেখিয়েই কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে চারটি শ্রমকোড চাপিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। দেশী বিদেশী কর্পোরেটদের স্বার্থবাহী এবং তীব্রভাবে শ্রমিক বিরোধী শ্রমকোড যদি লাগু হয় তাহলে তীব্র আন্দোলনে যাবে দেশের সকল শ্রমজীবী মানুষ। দশটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ইতিমধ্যে সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

গোটা পৃথিবীর সাথে আমাদের দেশ যখন কোভিড মোকাবিলায় বিপন্ন হয়ে পড়ছে, দেশের শ্রমিক, কৃষক, খেতমজুর সহ সমস্ত শ্রমজীবী অংশের যখন জীবন জীবিকা বিপন্ন, পরিযায়ী শ্রমিকরা সরকারের সহায়তা না পেয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাড়ি ফিরতে গিয়ে বেঘোরে প্রাণ হারাচ্ছে—ঠিক এইরকম দুর্বিষহ পরিস্থিতিকে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধিতে ব্যবহার করতেও পিছপা হয়নি দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় আসা মোদী সরকার। পুঁজিপতিদের স্বার্থে কৃষিজমি কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়া এবং শ্রম ব্যবস্থার সংস্কারের উদ্যোগ এইসময় তারা বেশি করে নিয়েছিল। কোভিড আক্রমণের সেই নিদারুণ সময়ে ২০-২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ কেন্দ্রীয় সরকার সংসদের উভয় কক্ষে তিনটি কৃষিবিল ও ৪টি শ্রমকোড পাস করিয়েছিল। ২৮ সেপ্টেম্বর '২০ রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেয়েছিল এই দুটি সংস্কারের উদ্যোগ। সাথে সাথেই সর্বভারতীয় কৃষক সংগঠন ও শ্রমিক সংগঠনগুলি প্রতিবাদে মুখর হয়েছিল। দেশের শ্রমজীবীদের আন্দোলনের ইতিহাসে উজ্জ্বল মাইলফলক হিসাবে পরিচিত হয়ে থাকবে ২৬ নভেম্বর ২০২০ দিনটি। ঐদিন কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদ্যোগের বিরুদ্ধে ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা সাধারণ ধর্মঘটে স্তব্ধ হয়ে যায় গোটা দেশ। ঐ একই দিন কৃষক-খেতমজুরদের সংগঠনগুলি দিল্লি অবরোধের কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে প্রবেশের ছয়টি রাস্তা বন্ধ করে সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলনে নামে। দুই শতর বেশি কৃষক সংগঠন এবং কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি এতে যুক্ত হয়েছিল এবং এক বছর মাটি কামড়ে, কোভিড সংক্রমণ, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষাকে উপেক্ষা করে সেই আন্দোলন চলেছিল এবং সফল হয়েছিল। স্বৈরাচারী সরকারের প্রধানমন্ত্রী কৃষকদের কাছে কার্যত ক্ষমা চাইতে বাধ্য হন এবং তিনটি কৃষি বিল প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রত্যাহার করে নেন। শাসক যতই শক্তিশালী হোক তার বিরুদ্ধে বৃহত্তম ঐক্য গড়ে, সাহসিকতার সাথে হার না মানা জেদ নিয়ে মরণপণ সংগ্রাম করতে পারা গেলে তাকে প্রতিহত করা যায়—ইতিহাসের এই শিক্ষা আবার তার নির্ভুলতা প্রমাণ করল।

দক্ষিণপন্থী শাসকদের শাসন পরিচালনার প্রসঙ্গে 'প্লুটো ক্র্যাসি' বলে একটি শব্দ ব্যবহার করা হয়। এর অর্থ বড় বড় কয়েকজন ধনী ব্যক্তি বা শিল্পপতির গ্রুপ এবং এদের নিয়ন্ত্রণেই সরকার পরিচালিত হয়। নরেন্দ্র মোদির পরিচালনায় কেন্দ্রের সরকারের নীতিও এইভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কয়েকজন শিল্পপতিকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও তাদের সহযোগিতার স্বার্থে। আম্বানি, আদানি, টাটা, বিড়লা ও মিত্তালদের নিয়ে মোদি সরকারের মূল সংসার। প্রায় দু'বছর আগে আর বি আই-এর প্রাক্তন ডেপুটি গভর্নর বিরল আচার্য একটি লেখায় এই ধরনের কথা বলেছিলেন। এদের এবং দেশী বিদেশী অন্যান্য কর্পোরেটদের খুশি করতেই চারটি শ্রমকোড দেশব্যাপী লাগু করতে চাইছে সরকার।

স্বাধীনতার পূর্বে ব্রিটিশ আমল থেকে স্বাধীনোত্তর ভারতে জোরদার শ্রমিক আন্দোলনের পরিণতিতে অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও শ্রমিক স্বার্থ রক্ষার্থে ২৯টি শ্রম আইন প্রচলিত আছে। সেই ২৯টি শ্রম আইনকে সমন্বিত করে চারটি শ্রমকোড তৈরি হয়েছে। এই চারটি শ্রমকোড হল—

(১) মজুরি সংক্রান্ত কোড, (২) পেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং কাজের পরিবেশ সংক্রান্ত কোড, (৩) শ্রম সম্পর্ক সংক্রান্ত কোড এবং (৪) সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোড। এই চারটি শ্রমকোড পরাধীন আমল থেকে আজ পর্যন্ত শ্রমিকদের অর্জিত অধিকার ক্ষুণ্ণ করবে এবং শ্রমিকদের দিক দিয়ে নেতিবাচকভাবে শ্রম ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটাবে।

মজুরি সংক্রান্ত কোড সম্পর্কে সরকার বলেছিল যে এটা সর্বজনীন ন্যূনতম মজুরির নিশ্চয়তা দেবে। তা আদৌ সঠিক নয়। বাস্তবে এর মধ্য দিয়ে মজুরি হ্রাস পাবে। এখানে শ্রমিকদের ফ্লোর ওয়েজের কথা বলা হয়েছে। 'ফ্লোর ওয়েজ' ন্যূনতম মজুরির চেয়ে কম হয়। আদতে পূর্বে কৃষি কমিশন ক্ষেত মজুরদের ক্ষেত্রে এই ফ্লোর ওয়েজের কথা বলেছিল। শ্রম কোডে সব শ্রমিকদের এতে অন্তর্ভুক্ত করে ন্যূনতম মজুরির হ্রাস ঘটানো হয়েছে। ১৫তম শ্রম কংগ্রেস ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে যে ফরমুলা দিয়েছিল সেটাকে মূল আইনে রাখা হয়নি।

পেশাগত নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোডে দৈনিক কাজের সময় ১২ ঘণ্টা করার ব্যবস্থা আছে। 'নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক নিয়োগ' (Fixed term employment)-এর কথা বলা হয়েছে। চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে এটা যেমন সত্য, তেমনই এটাও বাস্তব যে কর্মক্ষেত্রে একই ধরনের কাজে দুই ধরনের মজুরি থাকলে শ্রমিক ঐক্য গড়ে তোলাও কঠিন হয়ে উঠবে। আসলে মালিকদের হয়ে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চায় মোদি সরকার।

শ্রম সম্পর্ক বিষয়ক কোডে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধিকরণের প্রক্রিয়াকে কঠোর করা হয়েছে এবং কারখানা কর্তৃপক্ষকে যে কোনো ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতি বাতিলের একতরফা অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই কোডে কার্যত নিয়োগকর্তাকে 'হায়ার এন্ড ফায়ার' করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। শ্রম কোড আনার আগে 'এসেনশিয়াল ডিফেন্স সার্ভিসেস অ্যাক্ট' (ই ডি এস এ) অর্ডিন্যান্স-এর মাধ্যমে কার্যকর করে প্রতিরক্ষা দপ্তরের সাধারণ কর্মচারীদের (সিভিল) ধর্মঘটে নিষেধাজ্ঞা জারি এবং স্বাধীনতার পর এই প্রথম 'ধর্মঘটকে 'অপরাধমূলক' কাজের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ধর্মঘটকারী ও ধর্মঘটকে সমর্থনারীদের গ্রেপ্তারের ব্যবস্থায় রাখা হয়েছে। শ্রম সম্পর্ক বিষয়ক কোডে কর্তৃপক্ষকে যে কোনো কারখানা / প্রতিষ্ঠানে ই ডি এস এ ব্যবহার করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। মালিকদের সবচেয়ে বড় ভয় ধর্মঘটে। তাই ধর্মঘট করায় কঠোর শর্তাবলী নির্ধারিত হয়েছে কোডে।

সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোডে কোনো সুনির্দিষ্ট সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই। বরং এটি বর্তমানে চালু থাকা এই সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধাকে অনিশ্চিত করেছে। ই পি এফ, ই এস আই-এর আগামী দিনে অনিশ্চয়তার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছে এই কোড।

শ্রম কোড সংসদের উভয় কক্ষে গৃহীত হবার পর কেন্দ্র এই সংক্রান্ত খসড়া আইন প্রকাশ করেছে পূর্বেই; গোটা দেশে চালু করতে হলে রাজ্য সরকারগুলিকেও খসড়া আইন তৈরি করে কেন্দ্রে পাঠাতে হবে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু রাজ্য সরকার তা করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে অতি দ্রুত শ্রম কোড কার্যকরী করতে। এই চারটি শ্রমকোডের প্রবল বিরোধিতা করেছে দেশের সবক'টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন। ব্যতিক্রম শুধু রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শ্রমিক সংগঠন বি এম এস। তারা শুধু কিছু সংশোধন চেয়েছে শ্রম সম্পর্ক সংক্রান্ত কোডে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারও কখনও এর বিরোধিতা করেনি। এর বিরুদ্ধে শ্রমিক সংগঠনগুলির ঐক্যবদ্ধ অবস্থানে ভয় পেয়ে এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করতে বি এম এস-এর মতো কিছু সংশোধনের কথা মৃদু স্বরে ক'দিন আগে বলেছে।

শ্রমকোড যদি আইনে পরিণত হয় তাহলে দেশের ৭৫ শতাংশ কারখানার শ্রমিক শ্রম আইনের আওতার বাইরে চলে যাবে। এই উদ্যোগ নয়া উদারনীতি লাগামহীনভাবে প্রয়োগের দরজা আরও বড় করে খুলে দেবে। শ্রমজীবী মানুষকে মধ্যযুগীয় শোষণের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাবে এই তথাকথিত শ্রমকোড। এই শ্রমকোর্ডকে কেন্দ্র করে দেশে শাসকশ্রেণী ও শোষিত অংশের মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। কেন্দ্রের সরকার যেমন এই কোড দ্রুত কার্যকরী করতে বেপরোয়া, পাশাপাশি শাসকের চোখে চোখ রেখে চরম সংগ্রামের জন্য তৈরি শ্রমজীবী মানুষ। এই চরম দক্ষিণপন্থী আক্রমণের প্রতিরোধ, প্রতিবাদে গোটা দেশকে স্তব্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি। পাশে আছে কৃষক, ক্ষেতমজুর সহ অন্যান্য শ্রমজীবী অংশ এবং সর্বভারতীয় বিভিন্ন কর্মচারী ফেডারেশন।

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ১৯২৪ সালে 'ট্রেড ডিসপিউট অ্যাক্ট'-এর মাধ্যমে ধর্মঘটকে বেআইনী ঘোষণার উদ্যোগের বিরোধিতায় সংগামে নিজের জীবন উৎসগ করেছিলেন শহীদ ভগৎ সিং। ১১টি শ্রমবিষয়ক আইনকে বাতিল করে নির্মিত শ্রমকোড বাতিলের দাবিতে প্রত্যক্ষ সংগামে শহীদ ভগৎ সিং-এর নামে শপথ নিয়ে তৈরি হচ্ছে শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর, সহ সমস্ত শ্রমজীবী অংশ। এই সংগ্রাম শুধু শ্রমিক স্বার্থ রক্ষার জন্যই এই ভাবনার স্রোতে গা ভাসালে চরম ভুল হবে। শোষিত শ্রেণীর সর্ববৃহৎ অংশকে যদি নিরাপত্তাহীন করে দেওয়া যায়, তবে অদূর ভবিষ্যতে ছাড় পাবে না অন্য অংশগুলিও। ছাড় পাব না আমরাও। এটা অবশ্যই আশু সংগ্রামের ক্ষেত্রে আমাদের স্মরণে রাখা প্রয়োজন। □

১৩ মার্চ, ২০২৫

ডঃ মনমোহন সিং

ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং গত ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তাঁর স্ত্রী গুরশরণ কাউর ও তিন কন্যা বর্তমান। তাঁর মৃত্যুসংবাদে গোটা দেশে শোকের ছায়া নেমে আসে। দলমত নির্বিশেষে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বরা। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় এবং তাঁর মৃত্যুতে সাত দিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হয়।

ড. মনমোহন সিং ছিলেন একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ। অর্থনীতিবিদ হিসাবেই তিনি জীবন শুরু করে পরবর্তীকালে রাজনীতির আঙিনায় প্রবেশ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত শান্ত ও মৃদুভাষী প্রকৃতির মানুষ। ১৯৯১ সালে পি ভি নরসিমা রাওয়ের প্রধানমন্ত্রিত্বকালে সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসাবে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। সেই বছরই তিনি রাজ্যসভার সদস্য হন। তিনি এক সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নরের পদে ছিলেন। যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান হিসাবেও তিনি কাজ করেছেন। তাঁর হাত ধরেই আমাদের দেশে উদার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু হয়। তিনি অর্থমন্ত্রী থাকাকালীনই অর্থনীতির অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি থেকে পুরোদস্তুর সরকারী নিয়ন্ত্রণ সরিয়ে বেসরকারী পুঁজি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদেশি পুঁজিকেও জায়গা করে দেওয়া হয়। ২০০৪ সালে তিনি কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন প্রথম ইউ পি এ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন। তার আগে ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত তিনি বিরোধী দলনেতা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৯ সালে দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকার ক্ষমতায় আসলে তিনি পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হন। নিজস্ব বিশ্বাস অনুযায়ী দেশের কল্যাণে সহায়ক হবে এমন নীতিই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অর্থনৈতিক সংস্কার এবং জনগণের স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে জানতেন। প্রথম ইউ পি এ সরকারের আমলে বামপন্থীদের সহযোগিতায় তিনি দেশকে রূপান্তরের রাস্তা দেখিয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে সেই সরকার বামপন্থীদের সমর্থনে বেশ কিছু জনগণের স্বার্থবাহী নীতি ও কল্যাণমুখী পদক্ষেপ বাস্তবায়িত করেছিল। বামপন্থীদের সহযোগিতায় জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন, বনাঞ্চল অধিকার আইন এবং তথ্যের অধিকার আইনের মতো সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তাঁর আমলেই। □

ইন্দ্রজিৎ রায় চৌধুরী

শোক সংবাদ

শ্যাম বেনেগাল

বরেণ্য চিত্র পরিচালক শ্যাম সুন্দর বেনেগাল প্রয়াত হয়েছেন গত ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে মুম্বাইয়ের ওখার্ড হাসপাতালে সন্ধ্যা ৬.৩৮ মিনিটে। তিনি 'শ্যাম বেনেগাল' নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়েস হয়েছিল নব্বই বছর। বছর দুয়েক আগে তাঁর দুটি কিডনিই নষ্ট হয়ে যায়, ফলে নিয়মিত ভাবে তাঁকে ডায়ালিসিস করাতে হতো। গত ১৪ ডিসেম্বর তাঁর নব্বইতম জন্মদিনের অব্যবহিত পরেই ফের তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় এবং সেখানেই তাঁর প্রয়াণ ঘটে। তাঁর স্ত্রী ও কন্যা বর্তমান। হায়দ্রাবাদে সরস্বতী ও শ্রীধর বেনেগালের পুত্র শ্যামের জন্ম হয় ১৯৩৪ সালে। ছবি ছিল তাঁর রক্তে। তাঁর পিতা ছিলেন একজন পেশাদার ফোটোগ্রাফার। বরেণ্য চিত্রপরিচালক ও অভিনেতা গুরু দত্ত ছিলেন তাঁর এক সম্পর্কিত ভাই। এহেন উত্তরাধিকার বহন করে শ্যাম যে ছবির দিকেই ঝুঁ কবেন, এটা স্বাভাবিক। বাস্তব ক্ষেত্রে হয়েছিলও তাই। মাত্র ১২ বছর বয়েসেই চলচ্চিত্র নির্মাণে তাঁর হাতে-খড়ি হয়ে গেল এবং ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটিতে অর্থনীতি নিয়ে পড়তে পড়তেই তিনি স্থাপন করে ফেললেন 'হায়দ্রাবাদ ফিল্ম ক্লাব'। অর্থনীতিতে স্নাতক হওয়ার পরে শ্যাম চলে যান বোম্বাই (মুম্বাই) এবং সেখানে 'লিনটাস অ্যাড এজেন্সী'তে যোগ দেন একজন কপি রাইটার হিসেবে। কালক্রমে যত দিনে তিনি এর প্রধান নির্মাতা (ক্রিয়েটিভ হেড) হয়ে ওঠেন, তত দিনে তিনি বানিয়ে ফেলেছেন প্রায় ৯০০টা বিজ্ঞাপন ও ১১টা কর্পোরেট ফিল্ম।

পেশাদার পরিচালক হিসেবে তাঁর কাজ শুরু ১৯৬২ সালে 'ঘের বেঠা গঙ্গা' (গ্যাঞ্জেস অ্যাট ইওর ডোরস্টেপ) নামের স্বল্প দৈর্ঘ্যের এক গুজরাটি ছবির মাধ্যমে। এর পর থেকে তাঁকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি, তৈরি করে গেছেন একের পর এক ব্যতিক্রমী সিনেমা। তাঁর কাজের জন্যেই তাঁকে এক সময়ে ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের ডিরেক্টর (১৯৮০-৮৬) মনোনীত করা হয়। তিনি ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউটের একজন সম্মানিত শিক্ষকও ছিলেন এবং দুইবার তিনি এর চেয়ারম্যানও নির্বাচিত হন। এই সময়েই তিনি তৈরি করেন মূলতঃ দূরদর্শনের জন্যে দুটি যুগান্তকারী সিরিয়াল—'যাত্রা' (১৯৮৬, ভারতের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ জুড়ে দুটি ট্রেন যাত্রার কাহিনী, যেখানে যাত্রী হিসেবে বিভিন্ন শ্রেণীর নানান মানুষের কথা তুলে ধরা হয়েছে) এবং 'ভারত এক খোঁজ' (১৯৮৮-৮৯, যেখানে জওহরলাল নেহরুর ইতিহাসধর্মী রচনা 'ডিসকভারি অফ ইণ্ডিয়া' অবলম্বনে ৫৩টি পর্বে ৫০০০ বছরের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে)। অনেকে বলেন, ভারতে সমান্তরাল চলচ্চিত্রের অন্যতম জনক শ্যাম বেনেগালের ওপর সোভিয়েত রাশিয়ার দুই চিত্র পরিচালক সের্গেই আইজেনস্টাইন ও সুভেন্দ পুদোকিন এবং বাংলার সত্যজিত রায়ের প্রভাব ছিল অপরিসীম। ফলে এঁদের কাছ থেকে যে বীক্ষা তিনি পেয়েছিলেন, তাকে কাজে লাগিয়েছেন তাঁর প্রতিটি নির্মাণের পরতে পরতে। মূলতঃ দেশের গ্রামাঞ্চলের পিছিয়ে পড়া শ্রেণী, বিশেষত মেয়েদের জীবন নিয়েই আবর্তিত হয়েছে তাঁর বেশির ভাগ নির্মাণ। তাঁর প্রথম কাহিনী চিত্র 'অঙ্কুর' (১৯৭৪) তৈরি হয়েছিল ১৯৭১-৭২ সালে দেশে ফসলের চরম মন্দার প্রেক্ষাপটে দুই ভিন্ন জাতের নর-নারীর প্রণয়কে কেন্দ্র করে। ছবিটি বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রতিযোগিতার জন্য মনোনীত হয়। এর সাথে পর পর তাঁর আরও দুটি সৃষ্টি 'নিশান্ত' (১৯৭৫, জমিদারের মদতে এক অপহৃতার জীবন কাহিনী, কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের জন্যে মনোনীত) ও 'মন্থন' (১৯৭৬, ভার্গিস কুরিয়েনের নেতৃত্বে গুজরাটের প্রান্তিক গোয়ালাদের নিয়ে সমবায় তৈরি করে দেশে 'শ্বেত বিপ্লব' বা 'দুগ্ধ বিপ্লব' করে ফেলার কাহিনী)-কে একত্রে 'আপরাইজিং ট্রিলজি' নামে অভিহিত করা হয়। গত শতাব্দীর সাতের দশকে যখন দূরদর্শনের দাপটে ভারতীয় সিনেমা প্রায় বিপন্নতার মুখে, তখন যেন শ্যাম আরও দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠেন—একের পর এক নির্মাণ করেন 'ভূমিকা' (১৯৭৭, অতীতের দাপুটে মারাঠী মঞ্চাভিনেত্রী হংস ওয়াডকরের ছক ভাঙা জীবন নিয়ে), 'জুনুন' (১৯৭৯, মহা বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে এক অসবর্ণ প্রণয় কাহিনী) এবং 'কলযুগ' (১৯৮১, মহাভারত-এর কাহিনীর সাথে মিলিয়ে দুই ব্যবসায়ী জ্ঞাতির মধ্যের দ্বন্দ্বের কাহিনী)। বাণিজ্যিক দিক দিয়ে তিনটে ছবিই 'ফ্লপ' হলেও এই তিনটিকেই ভারতীয় চলচ্চিত্রের তিন মাইলস্টোন হিসেবে ধরা হয়। ১৯৯২-৯৩ সালে বোম্বাই রায়টের সময়ে যখন প্রায় ৯০০ মানুষের (মূলতঃ মুসলিম) জীবনহানি ঘটে যায়, শ্যাম দূরদর্শন ছেড়ে ফের ফিরে আসেন চলচ্চিত্র জগতে এবং সৃষ্টি করেন তাঁর অপর অবিস্মরণীয় ট্রিলজি 'মাম্মো' (১৯৯৪, দেশ বিভাগের পরে এ দেশের এক মুসলিমের কাহিনী) 'সর্দারি বেগম' (১৯৯৬, রায়টের সময়ে নিহত এক মুসলিম মহিলার জীবন কাহিনী) এবং 'জুবেইদা' (২০০১, এক স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করতে চাওয়া এবং দেশ বিভাগ সত্ত্বেও এই দেশে থেকে যাওয়া এক মুসলিম কন্যার কাহিনী)। ২০০৫ সালে শ্যাম চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ সম্মান 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কারে ভূষিত হন। ২০০৬ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত শ্যাম রাজ্য সভার মনোনীত সদস্য ছিলেন।

কয়েকটি তথ্যচিত্রও শ্যাম পরিচালনা করেছিলেন। এগুলির মধ্যে তাঁর আজীবন নায়ক নেহরুর উপর একটি এবং তার সাথে 'নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস, দি ফরগটেন হিরো' (২০০৫) ও 'সংবিধান, দি মেকিং অফ দি কন্সটিটিউশন' (২০১৪) উল্লেখযোগ্য। স্বাধীন বাংলাদেশের জনক শেখ মুজিবের ওপরেও তিনি একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করে তাঁর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন ('মুজিব, দি মেকিং অফ এ নেশন,' ২০২৩)। অবশ্যই শ্যাম বেনেগাল তাঁর পরিণত বয়েসেই প্রয়াত হয়েছেন, কিন্তু তাঁর প্রয়াণে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগৎ হারালো এমন এক মহীরুহকে, যিনি নিজের সম্পর্কে বলতেন, ''আমি নিজেকে আশাবাদী বা নিরাশাবাদী মনে না করে একজন বাস্তববাদী বলেই মনে করি। সমাজকে মনে করি পরিবর্তনশীল এক জগৎ, যেখানে আছে বিপুল পরিমাণে অসাম্য। একজন মানুষ হিসাবে এই অসাম্যর পরিবর্তন ঘটানো কর্তব্য। শুধু সমাজের পরিবর্তন ঘটালেই চলবে না—দরকার মানুষের পরিবর্তন ঘটানো''। পরিবর্তন তো আমরাও চাই! □

উৎসর্গ মিত্র

কেন্দ্রীয় বাজেট—২০২৫-২৬

শ্রেণী স্বার্থের উৎকট প্রদর্শন

প্রণব কর

এবছরের বাজেট পেশের বেশকিছু দিন আগে থেকেই একটা হইচই শুরু হয়ে গিয়েছিল যে এবারের বাজেটে মধ্যবিত্তদের জন্য চমক থাকবে। কেন্দ্রীয় বাজেটে মধ্যবিত্তদের ব্যাপারে চিন্তা মানে আয়কর ছাড়ের প্রসঙ্গটি মূলত আলোচিত হয়। এবারের বাজেটে ৭ থেকে ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের মানুষদের আয়কর ছাড়ের ব্যবস্থা করে মধ্যবিত্ত সমাজে এক ধরনের উন্মাদনা সৃষ্টির প্রচেষ্টা হয়েছে, মূলত মধ্যবিত্ত নির্ভর দিল্লির জোটের দিকে তাকিয়ে।

কিন্তু মূল সমস্যা আরও গভীরে নিহিত আছে। বাজেটের একটা শ্রেণী চরিত্র আছে। সংবিধানের ১১২ নং ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি আর্থিক বছরের জন্য তার আয় ও ব্যয়ের হিসেব সংসদে পেশ করে। কোন শ্রেণীর কাছ থেকে সরকার রাজস্ব আয় করবে আর কোন শ্রেণীর পিছনে সরকার সেই রাজস্ব ব্যয় করবে তারই হিসেবে দেওয়া থাকে বাজেটে।

এখন বর্তমানে বিশ্ব অর্থনীতি পরিচালিত হয় নব্য-উদার অর্থনীতি দ্বারা যার মূল কথা হচ্ছে সারা বিশ্ব জুড়ে পণ্য ও মূলধন অবাধে চলাচল করতে পারবে। কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার পর আবারও শুল্ক যুদ্ধ শুরু হয়েছে। ফলে অবাধে পণ্য চলাচলের জন্য যে GATT (General Agreement on Trade and Traiff) চুক্তি হয়েছিল তা ভেঙে পড়ার মুখে এসে দাঁড়াচ্ছে। ইতিমধ্যেই ট্রাম্প হুমকি দিয়েছেন যে ব্রিকসের অন্তর্গত দেশগুলি (যার অন্যতম সদস্য ভারত) যদি ডলারের বদলে অন্য মুদ্রায় নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য চালায় তবে আমেরিকা ব্রিকসের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির উপর ১০০ শতাংশ হারে আমদানী শুল্ক চাপাবে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নকে হুমকি দিয়েছেন যে যদি তারা আমেরিকা থেকে পেট্রো-পণ্য ও গ্যাস না কেনে তবে তাদের উপরেও বিশাল আমদানী শুল্ক চাপাবে। চিনের উপর ৬০ শতাংশ আমদানি শুল্ক চাপানোর হুমকি দেওয়া হয়েছে। ফলে আগামী দিনে রপ্তানী নির্ভর বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বের অনেক দেশই আভ্যন্তরীণ বাজারকে চাঙ্গা করার চেষ্টা শুরু করেছে তাদের বাজেটের মধ্য দিয়ে।

ইতিমধ্যেই ২০২২-২৫-এর অর্থনৈতিক সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে ২০২৩-২৪-এর ৮.২ শতাংশ জিডিপ বৃদ্ধির হার ২০২৪-২৫-এ কমে ৬.৪ শতাংশ। ২০১৯-২০ এবং কোভিড পর্বের ২০২০-২১ অর্থবর্ষ দুটিকে বাদ দিলে বৃদ্ধির এই অধোগতি ২০১২-১৩ সালের পর থেকে সর্বনিম্ন। কৃষি, বনজ সম্পদ, প্রশাসন, প্রতিরক্ষা বাদে সবক্ষেত্রেই বৃদ্ধি কমেছে। এমনকি কৃষি উৎপাদনও বাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞদের একাংশের অভিমত রয়েছে।

বৃদ্ধির হার কমার অপর একটি নিদর্শন হল এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত ব্যাঙ্কের ঋণদানের হার মাত্র ৪.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ঠিক পূর্ববর্তী অর্থবর্ষে ছিল ১০.৮ শতাংশ। রিয়েল এস্টেট এবং গৃহঋণ নেবার ক্ষেত্রে তীব্র ঘাটতি দেখা গেছে এই অর্থবর্ষে। গাড়ি কেনার ঋণ নেবার ক্ষেত্রেও বিপুল ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। সামগ্রিকভাবে এই ঘটনাগুলি প্রমাণ করছে যে চাহিদার বিপুল হ্রাস ঘটেছে। এটি এমন একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে ২০০৩ সালের পরবর্তী সময় থেকে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহণ করে পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রে (গৃহ, রাস্তা ইত্যাদি) বিনিয়োগ ভারতীয় অর্থনীতির বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অনুরূপভাবে এই অর্থবর্ষে জি.এস.টি.-র বৃদ্ধির হারও দুর্বল হয়েছে। সামগ্রিকভাবে এই পরিসংখ্যানগুলি প্রমাণ করছে যে অর্থনীতিতে চাহিদা হ্রাস পাচ্ছে।

এখন এই চাহিদা হ্রাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে এবারের অর্থনৈতিক সমীক্ষা (FY 25) যে কারণটি তুলে ধরেছে সেটি হল শ্রমজীবী মানুষের মজুরি কোভিড অতিমারীর পর্যায়ের থেকেও নীচু স্তরে অবস্থান করা। বেকারত্বের হার কিছুটা কমলেও আসলে তার একটা বড় অংশ আয়বিহীন জীবিকা (মহিলাদের গৃহস্থালীর

কাজ) অথবা একই কাজ অনেকের মধ্যে ভেঙে গিয়েছে (ছদ্ম বেকারী)। পাশাপাশি শিল্পপতিদের লাভ বিগত ১৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে থাকলেও, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে পুঁজিবাদ খাতে 'অ্যানিমাল স্পিরিট' দেখা যাচ্ছে না। বরং তাদের একটা বড় অংশই ফাটকা পুঁজিতে বিনিয়োগ করতে ব্যস্ত রয়েছেন। যার ফলে শিল্প বিনিয়োগ এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত চাকরি প্রায় স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। শিল্পপতিদের হাতে কোটি কোটি টাকা অনুদান তুলে দিলেও শিল্প বিনিয়োগ বাড়বে না, যতক্ষণ না শিল্প পণ্যের জন্য চাহিদা তৈরি হচ্ছে।

এরই প্রেক্ষাপটে আমাদের এবছরের কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট পর্যালোচনা করতে হবে। চাহিদা বৃদ্ধির জন্য এবারের বাজেটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলতে এবারের মধ্যবিত্ত অংশের আয়কর ছাড়ের কথা ব্যাপকভাবে প্রচার করে চলেছে গদী মিডিয়া। সত্যি কতটা চাহিদা সৃষ্টি করবে এই আয়কর ছাড়? আগে বার্ষিক সাত লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়করে ছাড় ছিল। এবারে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকায়। চাকুরেদের ক্ষেত্রে তা এসে দাঁড়াচ্ছে ১২.৭৫ লক্ষ টাকা। মাসিক আয়ের ক্ষেত্রে ৫৮ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত যাদের আয় তারাই এর আওতায় নতুন করে ঢুকছে. প্রাথমিক একটি হিসেবে বলছে যে ৫.৬ কোটি ভারতবাসী এর আওতায় পড়ছেন, যা জনসখ্যার মাত্র ৩.৮ শতাংশ। আবার আয়কর বিন্যাস এমন করা হয়েছে যে ১২ লক্ষ টাকা উপার্জনকারীর ছাড় হবে ৩৮.৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু ২৪ লক্ষ টাকা উপার্জনকারীর ছাড় হবে ১.১ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ উপার্জন যত বেশি ছাড় তত বেশি।

কিন্তু বাজেট পেশ করবার ঠিক দুইদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকারের যে হাউসহোল্ড কনজিউমার এক্সপেনডিচার সার্ভে (HCES)-এর রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে গ্রামীণ ক্ষেত্রে চারজন সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিবারের মাসিক গড় খরচ ৮,৩১৬ টাকা এবং শহরাঞ্চলে তা ১৪,৫২৮ টাকা। অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে একটি পরিবারের বার্ষিক গড় খরচ ৯৯,৭৯২ টাকা এবং শহরাঞ্চলে তা ১,৭৪,৩৩৬ টাকা। সাধারণভাবে এই খরচের পরিমাণকেই গড় আয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই আয়কর ছাড়ের কোনো সুবিধা পাবেন না ভারতের বিপুল অংশের জনগণ। সাধারণভাবে এই বিপুল অংশ আসলে ভারতের শ্রমজীবী জনসাধারণ, যাদের মধ্যে বিপুল চাহিদা রয়েছে, কিন্তু চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত আয় নেই।

সবদেশেই চাহিদা পূরণের জন্য K-এর একটি আকড়ি ঊর্ধ্বমুখী অপরটি নিম্নমুখী। জনসাধারণের একটি অংশের চাহিদা বৃদ্ধি করা হয়, আর একটি অংশের চাহিদা নিয়ন্ত্রিত করা হয়। চীন চাহিদা বৃদ্ধির জন্য তার দেশের শ্রমজীবী মানুষের মজুরি (wage) বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু ভারত তার শ্রমজীবীদের চাহিদাকে নিয়ন্ত্রিত করে মধ্যবিত্তের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য আয়কর ছাড় দিচ্ছে। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে শ্রমজীবী মানুষের মজুরি বৃদ্ধি পেলে তার প্রায় সবটাই সে ব্যয় করে চাহিদা মেটাতে, কিন্তু মধ্যবিত্ত তার বর্ধিত আয়ের একটা অংশ সঞ্চয় করে। ফলে চাহিদা বৃদ্ধি করতে হলে শ্রমজীবী মানুষের মজুরি বৃদ্ধি করা সব থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। কিন্তু নব্য উদার অর্থনীতির দ্বারা পরিচালিত অর্থ ব্যবস্থায় ভারত সরকারের এই পদক্ষেপ নেবার ক্ষমতা নেই, কারণ তাহলে আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজির কোপে পড়বে ভারত।

মধ্যবিত্তের কর ছাড়ের মধ্য দিয়েও কিছুটা চাহিদা সৃষ্টি করা যায় যদি এই ছাড় অর্থনীতির অন্য অংশে খরচের হ্রাস না ঘটায়। এখন ২০২৫-২৬-এর বাজেটে দেখা যাচ্ছে যে, মূলধনী খাতে (Capital Expenditures, CAPEX) ব্যয় প্রায় ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য হচ্ছে যে মূলধনী খাতে ব্যয় বৃদ্ধি এবং মধ্যবিত্তকে কর ছাড় দেবার মধ্য দিয়ে অর্থনীতিতে চাহিদার সৃষ্টি হবে। কিন্তু যদি বাজেটে মোট ব্যয়ের দিকে নজর রাখা হয় তাহলে দেখা যাবে মাত্র ৭ শতাংশ মোট ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে। (সারণী-১ দ্রষ্টব্য)

অর্থাৎ মূলধনী খাতে ব্যয় বাড়লেও মোট ব্যয় মাত্র ৭ শতাংশ বেড়েছে। মূল্যবৃদ্ধিকে হিসেবের মধ্যে ধরলে বলতে হয় যে প্রকৃত ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোনো বৃদ্ধি ঘটেনি। তাহলে কোথাও ব্যয় হ্রাস ঘটিয়ে নিশ্চয়ই মূলধনী খাতে ব্যয় বৃদ্ধি ঘটেছে। দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পগুলি থেকে বরাদ্দ কমানো হয়েছে। (সারণী-২ দ্রষ্টব্য)

খাদ্য সুরক্ষা আইন অনুযায়ী খাদ্যে ভরতুকি ২০২২-২৩ সালে যেখানে ছিল ২.৭৩ লক্ষ কোটি টাকা, সেটাই ২০২৪-২৫-এর Revised Estimate-এ কমে দাঁড়িয়েছে ১.৯৭ লক্ষ কোটি টাকা এবং ২০২৫-২৬-এর বাজেটে তা এসে দাঁড়িয়েছে ২.০৩ লক্ষ কোটি টাকায়। তিন বছরে খাদ্যে অনুদান কমেছে ৭০ হাজার কোটি টাকা যখন পৃথিবীর অর্ধেক অভুক্ত মানুষের ঠিকানা ভারত।

একইভাবে রেগার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ২০২৩-২৪-এর প্রকৃত বাজেটে যেখানে ৮৯,১৫৪ কোটি টাকা বণ্টন করা হয়েছিল তা এখন নেমে দাঁড়িয়েছে ৮৬,০০০ কোটি টাকায়। এনরেগা সংঘর্ষ মঞ্চের একটি হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে যে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে যেখানে গড় বার্ষিক কাজের দিন ছিল ৫২ দিন, ২০২৪-২৫ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে গড়ে ৪৫ দিন। ইতিমধ্যে গত বছরের ৬,৯৫০ কোটি টাকা বাকি রয়ে গেছে, ফলে প্রকৃত বণ্টন আরও কমবে। এনরেগাতে বাজেট বরাদ্দ অন্তত ২.৫ লক্ষ কোটি টাকা করার দাবি রয়েছে।

সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি এবং পোষণ ২.০ প্রকল্পে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের তুলনায় ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ১৫০ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে ৪ কোটি শিশু ও ২ কোটি মায়ের বছরে ৩০০ দিনের জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের সংস্থান করা হয়। এইসব খাদ্যের মূল্যহার শেষবার পর্যালোচনা করা হয়েছিল ২০১৭ সালে। বাজেট বরাদ্দ যা বেড়েছে তাতে ৭ বছর পরে প্রতি শিশু ও মায়ের জন্য দৈনিক বরাদ্দ ৫ পয়সা করে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সারে ভর্তুকি উল্লেখযোগ্য ভাবে কমছে। ২০২৩-২৪ সালেও সেখানে ১,৮৮,২৯২ কোটি টাকা বণ্টন করা হয়েছিল তা এবারের বাজেটে কমে ১,৬৭,৮৮৭ টাকা ঘোষণা করা হয়েছে। এমনিতেই কৃষকসমাজ চাষের উপকরণের দামে জেরবার হয়ে রয়েছে, সেরকম এক সময়ে এই বরাদ্দ হ্রাস আরও সংকট তৈরি করবে।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এবারের বরাদ্দ গতবারের তুলনায় ৯.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও জিডিপির শতাংশের তুলনা হিসেবে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বরাদ্দ হ্রাস পেয়েছে। মূল্যবৃদ্ধির হার হিসেবে ধরলে প্রকৃত বৃদ্ধি কিছুই হয়নি। শিক্ষাক্ষেত্রেও বরাদ্দ সংকোচন হয়েছে মূল্যবৃদ্ধির হিসাব যুক্ত করলে। কৃষিক্ষেত্রেও মোট বরাদ্দ গত অর্থবর্ষের তুলনায় বেড়েছে মাত্র ৪ শতাংশ। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে কৃষিক্ষেত্রের বরাদ্দ ১.৩২ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১.৩৭ লক্ষ কোটি টাকা। মূল্যবৃদ্ধির হিসাব যুক্ত করলে কৃষিক্ষেত্রেও বরাদ্দ হ্রাস ঘটেছে।

কৃষিক্ষেত্রে ২০২০-২১ অর্থবর্ষ থেকে ধারাবাহিকভাবে বরাদ্দ কমছে। অথচ জিডিপির ক্ষেত্রে কৃষির অংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৬ শতাংশ হয়েছে এবং কর্মসংস্থান তৈরির ক্ষেত্রে কৃষির ভাগ ৪৪.১ (২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে) শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ৪৬.১ শতাংশ হয়েছে। অর্থাৎ অর্থনীতির যে ক্ষেত্রটি সব থেকে বেশি কর্মসংস্থান তৈরি করে চলেছে সেখানেই তীব্র বঞ্চনা চলছে। কৃষকদের অনেকদিন ধরে দাবি রয়েছে স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী c_2+50% হিসাব ধরে কৃষিপণ্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য তৈরি করতে হবে। কিন্তু এবারের বাজেটেও তা উপেক্ষিত রয়ে গেল। এই ন্যূনতম সহায়ক মূল্যর ব্যবস্থা করলে প্রকৃত চাহিদা বৃদ্ধি পেত বিপুলভাবে। কিন্তু কর্পোরেট লবির চাপে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করার সাহস দেখাতে পারল না কেন্দ্রীয় সরকার।

ফলে এটা বোঝা যাচ্ছে যে মধ্যবিত্তদের জন্য যে ১ লক্ষ কোটি টাকা কর ছাড় দেওয়া হচ্ছে তা মেটানো হচ্ছে সামাজিক প্রকল্পগুলিতে কাটছাঁট করে। অর্থাৎ বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের জন্য ব্যয় বরাদ্দ কমিয়ে তা তুলে দেওয়া

(সারণী-১)

Budget-2025-26

[In Rs. Crore]

	2023-24 Actuals	2024-25 Budget Estimates	2024-25 Revised Estimates	2025-26 Budget Estimates
i. Centre's Expen diture	4443447	4820512	4716487	5065345
ii. Capital Expen diture	12,53,111	15,01,889	13,18,320	15,48,282

(সারণী-২)

[In Rs. Crore]

		2023-24 Actuals	2024-25 B.E	2024-25 R.E	2025-26 B.E
i.	Food Subsidy	211813.39	205250.01	197420.00	203420.00
ii.	Mahatma Gandhi National Rural Em-ployment Guarantee Programme	89154	86000	86000	86000
iii.	Fertiliser	188292	164000	171299	167887
iv.	Petroleum	12240	11925	14700	12100
v.	Education	123365	125638	114054	128650
vi.	PM Poshan	8458	12467	10000	12500
vii.	Saksham Angan-wadi and POSHAN 2.0 (umbrella) ICDS-Anganwari Services, Poshan Abhiyan, Scheme for Adolescent Girls)	21810	21200	20071	21960
viii.	Health	81,594	89,287	88,032	98311

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

ভাষা আন্দোলন ও আজকের বাংলাদেশ

সুমিত ভট্টাচার্য

২১ ফেব্রুয়ারি দিনটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য আমরা সকলেই জানি। এই দিনটি বর্তমানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃত। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বরে রাষ্ট্র সংঘের অধীনস্থ সংস্থা 'ইউনেস্কো' কানাডায় বসবাসকারী কয়েকজন বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবীদের যৌথ আবেদনের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যদিও ইউনেস্কো স্বীকৃতি প্রদান করার পরেই ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটি মাতৃভাষা দিবস হিসেবে আমাদের কাছে পরিচিতি লাভ করে, তা কিন্তু নয়। বরং বিষয়টা ঠিক বিপরীত। ইউনেস্কোর স্বীকৃতি লাভের বহু আগে থেকেই, ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটি ছিল মাতৃভাষার দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনের প্রতীক। ইউনেস্কো সেই রক্তে রাঙা ইতিহাসকেই স্বীকৃতি দিয়েছে মাত্র।

বাঙালীর মাতৃভাষা বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে, এই দাবিতে গড়ে ওঠা রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল সদ্য স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের অংশ আজকের বাংলাদেশ, তৎকালীন পূর্ববঙ্গ। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের মুসলীম লীগ সরকারের পুলিশ আন্দোলনরত ছাত্র ও নাগরিকদের ওপর প্রথমে টিয়ার গ্যাস ও পরে কয়েক রাউন্ড গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে শহীদের মৃত্যুবরণ করেন রফিক, সালাম, বরকত ও আব্দুল জব্বার। এঁদের মধ্যে বরকত ও আব্দুল জব্বার ছিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ২২ ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ মিছিলে পুলিশ পুনরায় আক্রমণ করলে, সেদিন শহীদের মৃত্যু বরণ করেন শফিকুর রহমান, রিক্সা চালক আউয়াল এবং আলি উল্লাহ। ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরের রাজপথ শহীদের রক্তে রাঙা হওয়ার পর থেকেই দিনটি ভাষা শহীদ দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। অমর ২১শে ফেব্রুয়ারিকে স্মরণ করে সাংবাদিক ও লেখক আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী রচনা করেন গান—

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২১ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি?'

প্রথমে আবদুল লতিফ গানটি সুরারোপ করেন। তবে পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালে আলতাফ মামুদের সুরে গানটি বেশি জনপ্রিয় হয়।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষা তথা মাতৃভাষার রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে শহীদ হয়েছিলেন বাংলাদেশের (পূর্ববঙ্গ) মানুষ। কিন্তু এই দিনটির তাৎপর্য শুধুমাত্র এই রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর তাৎপর্য সুদুরপ্রসারী। সে সম্পর্কে কিছু বিষয় আলোচনা করার আগে যা বলা দরকার তা হল, মাতৃভাষার স্বীকৃতির দাবিতে গণজাগরণ এবং প্রাণ বিসর্জনের ঘটনা পূর্ববঙ্গেই প্রথম ঘটেছিল তা কিন্তু নয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তো বটেই এমনকি স্বাধীনতার আগে অবিভক্ত ভারতবর্ষে এবং স্বাধীনতার পরে ভারত ভূখণ্ডে মাতৃভাষার স্বীকৃতির দাবিতে গণআন্দোলন, এমনকি শহীদের মৃত্যুবরণের নিদর্শন রয়েছে। আসলে মাতৃভাষাকে ঘিরে মানুষের আবেগ সহজাত। একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষাই, সেই জনগোষ্ঠীর সামাজিক কর্মকাণ্ড এবং সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির প্রধান মাধ্যম। সেই জনগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেণী বিভাজন থাকলেও, মাতৃভাষার প্রতি অন্তর্লীন আবেগ কিন্তু শ্রেণী নিরপেক্ষ।

প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও দার্শনিক নোয়াম চমস্কি তাই বলেছেন, "যে সমাজ তার মাতৃভাষাকে হারায়, সে তার স্মৃতিকে হারিয়ে ফেলে।" স্বভাবতই কোনো এক বিশেষ জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা যখন রাষ্ট্রনীতিতে উপেক্ষিত হয় বা রাষ্ট্র নির্বাচিত অপর ভাষার হানাদারির কবলে পড়ে, তখনই অন্তর্লীন আবেগের বহির্বিস্ফোরণ ঘটে। ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পাওয়া এমনই কয়েকটি ভাষা আন্দোলনের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৯৬০ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদিবাসীরা (রেড ইন্ডিয়ান) দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে তাদের ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলন করে এবং অবশেষে সেই অধিকার অর্জন করে। ১৯৭৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহেনেস বার্গে মাতৃভাষা জুলুতে শিক্ষাদানের দাবিতে শতাধিক মানুষের প্রাণ যায়। এই ভাষা আন্দোলন বর্ণবিদ্বেষবাদ বিরোধী আন্দোলনে অনুঘটকের কাজ করে। সম্প্রতি ২০১১ সালে স্পেনে আন্দালুসিয়ান ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়।

১৯৩৭ সালে অবিভক্ত ভারতের মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে বাধ্যতামূলক হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে মাতৃভাষার অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলন সংগঠিত হয়। দু'জন শহীদ হন। স্বাধীনতার পর ১৯৬৫ সালে একই কারণে আবার এই আন্দোলন শুরু হয়। এই পর্বের আন্দোলনে মাদ্রাজ ও আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। দেশভাগের সময় পুরুলিয়া জেলাকে বিহারের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছিল। ফলে বাধ্যতামূলক হিন্দীর ব্যবহার মানভূম অঞ্চলের বাংলাভাষী মানুষের অস্মিতায় আঘাত করে। শুরু হয় বাংলাভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলন। এই আন্দোলনই পুরুলিয়া জেলাকে বিহার থেকে বিযুক্ত করে, পশ্চিমবাংলার সাথে যুক্ত করে। ১৯৬১ সালে আসামে বসবাসকারী বাংলাভাষী মানুষেরা মাতৃভাষার

স্বাধিকার রক্ষার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। ১৯ মে শিলচরের বরাক উপত্যকায় আন্দোলনরত ১১ জন পুলিশের গুলিতে শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। সুতরাং তৎকালীন পূর্ববঙ্গ বা আজকের বাংলাদেশই একমাত্র ভূখণ্ড নয়, যেখানে ভাষা আন্দোলন ও শহীদের মৃত্যুবরণের ঘটনা ঘটেছিল।

কিন্তু বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হল, এই আন্দোলন শুধুমাত্র মাতৃভাষার স্বীকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। কারণ এই ভাষা আন্দোলন এক বিশেষ ধরনের জাতীয়তাবাদী চেতনার বীজ রোপন করেছিল পূর্ববঙ্গের (পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান) মানুষের চেতনায়। যা, ১৯৫৫ সালে বাংলাভাষা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভের পরেও বহমান রইল এবং যা চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করেছিল মুক্তিযুদ্ধ এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে।

এই প্রসঙ্গে 'জাতীয়তাবাদ'-এর বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে ইউরোপে 'নেশনস্টেট' বা 'জাতি রাষ্ট্র'র ধারণার বিকাশ ঘটতে শুরু করে। ১৬৪৮ সালে বিভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত 'ওয়েষ্টফেলিয় চুক্তি' জাতিরাষ্ট্রের সার্বভৌমের নীতিগুলিকে চিহ্নিত করে। এক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ না করাকে 'ওয়েষ্টফেলিয়' ব্যবস্থা বলা হয়। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। তা হল, চার্চ ও রাজপরিবারের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ থেকে রাষ্ট্রকে মুক্ত করা। এর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ধারণার ভিত্তিতে ন্যাশালিজম বা জাতীয়তাবাদ নামে এক ভাবাবেগ তৈরি করা হয়েছিল। এই ভাবাবেগ যাতে সাধারণ পরিস্থিতিতেও স্তিমিত না হয়ে যায়, তার জন্য নিজেদের মধ্যেই এক বাইরের শত্রুকে, বহিরাগতকে, অপরকে খুঁজে বের করা হত (যেমন আইরিশ, ইহুদি ইত্যাদি)। বর্তমান সময়েও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নব্য ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলি একই কায়দায় অপরকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে উগ্র জাতীয়তাবাদী আবেগ তৈরি করছে। আমাদের দেশেও আর এস এস ও সঙ্ঘ পরিবার এই ধরনের জাতীয়তাবাদী প্রকল্পের প্রচারক।

কিন্তু আমাদের দেশ সহ ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে 'জাতীয়তাবাদী' চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল, চরিত্রগতভাবে তা ওয়েষ্টফেলিয় জাতীয়তাবাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের। এই জাতীয়তাবাদের চরিত্র 'ইনক্লুসিভ'। সব ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-সম্প্রদায়কে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। এই জাতীয়তাবাদী ধারণায় কোনো অভ্যন্তরীণ 'অপর' বা 'শত্রু' নেই। এখানে সব অংশের মানুষের সাধারণ শত্রু সাম্রাজ্যবাদ। এই জাতীয়তাবাদী ধারণার পরিপক্ক রূপই হল ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও ভাষা ভিত্তিক রাজনৈতিক ধারণার বিকাশ। স্বাধীনতা উত্তর ভারতে ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবিতে বিশালান্ধ্র ঐক্য কেরালা ও সংযুক্ত মহারাষ্ট্রে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ইনক্লুসিভ জাতীয়তাবাদই ছিল ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠনের প্রেরণা। বামপন্থীরা এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

অবিভক্ত ভারতেরই অংশ ছিল তৎকালীন পূর্ববঙ্গ। দেশভাগের পর যা ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। স্বভাবতই পূর্ববঙ্গের মানুষও সেই জাতীয়তাবাদী চেতনার ধারক ছিলেন। পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও, পূর্ববঙ্গের মানুষ শুরু থেকেই স্বাধীনতার আস্বাদ পাননি। কারণ রাষ্ট্র হিসেবে অবিভক্ত ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হলেও, কার্যত তিনটি ভৌগোলিক ভূখণ্ড তৈরি হয়েছিল। স্বাধীন ভারতের দু'পাশে থাকা পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ববঙ্গকে (১৯৫৫ সালে নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান) নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র। এই দুই ভূখণ্ডের মধ্যে ব্যবধান ছিল ২০০০ কিলোমিটার। উপরন্তু পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৪ শতাংশ মানুষ কথা বলতেন বাংলাভাষায়। উর্দুভাষী মানুষের সংখ্যা ৭.১ শতাংশ। অথচ ১৯৪৮ সালেই মহম্মদ আলি জিন্নাহ ঘোষণা করেন, উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।

পাকিস্তান সরকারের সিদ্ধান্তকে পূর্ববঙ্গের মানুষ মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা প্রতিবাদ শুরু করেন। তাঁদের মনে হয়েছিল পূর্ববঙ্গকে নতুন করে ভাষা উপনিবেশে পরিণত করা হচ্ছে। তাই মাতৃভাষার স্বীকৃতির দাবিতে প্রতিবাদ-আন্দোলন শুরু হয় তখন থেকেই। যা ছিল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সলতে পাকানোর পর্ব। কিন্তু পূর্ববঙ্গের মানুষের ক্ষোভের অভিব্যক্তি শুধুমাত্র ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই ঘটেছিল তা নয়। কৃষক আন্দোলন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। পূর্ববঙ্গের কৃষকদের অধিকাংশ ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু জমিদারদের বৃহৎ অংশই উচ্চবর্ণের হিন্দু। এই হিন্দু জমিদাররা ছিল পাকিস্তানের মৌলবাদী সরকারের একনিষ্ঠ সমর্থক। অবিভক্ত বাংলার তেভাগা আন্দোলনের রেশ ধরেই পূর্ববঙ্গে শুরু হয়েছিল 'টংক' প্রথা বিরোধী আন্দোলন। তিন লক্ষ কৃষকের স্বার্থে টংক প্রথা বাতিলের দাবিতে ঢাকা হাইকোর্টে মামলা করেন বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য প্রদীপ স্যান্যাল।

ঐ মামলায় বিবাদী পক্ষে পাকিস্তানের মুসলিম মৌলবাদী সরকারের সঙ্গে ছিলেন মালদুয়ারের হিন্দু জমিদার। কৃষকদের সংগঠিত করার কাজে কমিউনিস্ট নেতা সত্যেন সেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তেভাগা আন্দোলনের সময় সলিল চৌধুরীর লেখা গান 'হেঁই সামালো ধান হো...." যেমন জনপ্রিয় হয়েছিল, তেমনই টংক প্রথা বিরোধী আন্দোলনে হামিদ শেখের লেখা গান—'আর নয় ধান, আর নয় প্রাণ / শোনো হে কৃষক ভাই / এসে গেছে দিন শোধ কর ঋণ' বিপুল জনপ্রিয় হয়েছিল।

ভাষা আন্দোলন তার কাঙ্খিত জয় পায় ১৯৫৫ সালে। ঐ বছর পাকিস্তানের সংবিধান রচনার জন্য গঠিত গণপরিষদে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পায়। পাকিস্তানের সংবিধানের ২১৪ নং অনুচ্ছেদে উর্দু ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু এই স্বীকৃতির পরেও ভাষা আন্দোলন যে জাতীয়তাবাদী চেতনার দাবানল সৃষ্টি করেছিল, তা নিভে যায় নি। বরং তা প্রতিবাদ থেকে প্রতিরোধের সুসংহত স্তরে উন্নীত হয়। পাঁচ ও ছয়ের দশক জুড়ে একের পর এক গণআন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ে। ৬ দফা কর্মসূচী, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের গণজাগরণ, আয়ুব খান বিরোধী ১৯৬৯ সালের গণজাগরণ ছিল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি। অবশেষে ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করে।

গত বছর (২০২৪) ৫ আগস্ট গণরোষের মুখে ইস্তফা দেন ও সেনা পরিবৃত হয়ে দেশ ত্যাগ করেন মুজিব কন্যা শেখ হাসিনা। নোবেল শান্তি পুরস্কার ভূষিত অর্থনীতিবিদ মহম্মদ ইউনুসকে প্রধান করে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। ২৫ আগস্ট মহম্মদ ইউনুস উদার, গণতান্ত্রিক, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গঠনের কথা বলেন, অথচ সেদিনই ঐ দেশের প্রধান মুসলিম মৌলবাদী দল 'জামাত' ইসলামী শক্তির একজোট হওয়ার কথা ঘোষণা করে। হেফাজতে ইসলাম, ইসলামী ঐক্য জোট জামাতের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ পথচলার কথা ঘোষণা করে। অন্তর্বর্তী সরকার জামাত ও তার ছাত্র শাখার ওপর থাকা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে। অন্তর্বর্তী সরকারের এই সিদ্ধান্ত ছিল স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়া লাখো শহীদ, সম্ভ্রম হারানো দু'লক্ষ নারীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। কারণ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে জামাত পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল। শেখ হাসিনার পদত্যাগ পরবর্তী টালমাটাল পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নেয় বিভিন্ন রংয়ের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি। ঢাকার ৩২ নং ধানমান্ডি রোডে বঙ্গবন্ধু সংগ্রহ শালা পুড়িয়ে দেওয়া হয়। সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা প্রেস ক্লাবে মহম্মদ আলি জিন্নাহর মৃত্যু বার্ষিকী পালিত হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে এই প্রথম, মুজিবুর রহমানের পরিবর্তে জিন্নাহকে জাতির পিতা ঘোষণা করার দাবি উঠছে।

মুক্তি যোদ্ধাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য ঘোষিত বিশেষ কোটা ব্যবস্থা বাতিলের দাবিতে ছাত্র আন্দোলন শুরু হলেও, অচিরেই তা হাসিনা সরকারের স্বৈরাচারী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জনরোষের চেহারা নেয়। কিন্তু এগুলিই সব নয়। সুনির্দিষ্ট কয়েকটি আর্থ-সামাজিক কারণ হাসিনা সরকারের জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাস করেছে।

বছর খানেক আগেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ছিল বিস্ময়ের। কিন্তু অগ্রগতির সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বৈষম্য। দেশের মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়েছে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় নি। ১ শতাংশ অতি ধনীর হাতে রয়েছে মোট সম্পদের ২৪ শতাংশ। উপরতলার ১০ শতাংশের হাতে রয়েছে মোট সম্পদের ৭০ শতাংশ। নীচের ৫০ শতাংশের হাতে রয়েছে মাত্র ৪.৮ শতাংশ। বাংলাদেশে এক কোটির বেশি টাকা রয়েছে এমন অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ২০০০

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে

ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

কমরেড প্রণব চট্টোপাধ্যায় এই নিবন্ধটি লিখেছিলেন সংগ্রামী হাতিয়ার, নভেম্বর ২০১৪ সংখ্যায়। আজ থেকে ১০ বছরেরও বেশি সময় আগের এই নিবন্ধটি বর্তমান সময়েও প্রাসঙ্গিক। কমরেড প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার পক্ষ থেকে এই নিবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হল এই সংখ্যায়।

সাম্প্রদায়িকতার বিপদ বর্তমান আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও রাজ্য পরিস্থিতির পটভূমিতে এক নতুন মাত্রা অর্জন করেছে। বিশেষত আন্তর্জাতিক স্তরে মুসলিম মৌলবাদপুষ্ট সন্ত্রাসবাদ ভয়ঙ্কর মাত্রা নিয়েছে। ইতোমধ্যে ইসলামিক স্টেট অব ইরাক অ্যান্ড সিরিয়া (আই এস আই এস যা বর্তমানে আই এস নামে পরিচিত) ইরাকের উত্তর অঞ্চল এবং সিরিয়ার একটা অংশ দখল করে নিজেদের রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করেছে। যিনি এর প্রধান তিনি নিজেকে নয়া খলিফা হিসাবে ঘোষণা করেছেন। নাইজেরিয়ায় বোকো হারাম গোষ্ঠী ইতোমধ্যে উচ্চমাধ্যমিকের ৩০০ ছাত্রীকে অপহরণ করে তাদের যৌন দাসী করেছে। এর পাশাপাশি তালিবান প্রমুখ সংগঠনের হিংসাত্মক তৎপরতা তো রয়েইছে।

আমাদের দেশে ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের পর ফ্যাসিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী হিন্দুত্ববাদী শক্তি আর এস এস পরিচালিত বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে কার্যত একদলীয় সরকার গঠন করেছে। এবারের ষোড়শ সংসদে মাত্র ২২ জন মুসলিম সাংসদ রয়েছে, স্বাধীনতা উত্তরকালে এর কোনও পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই। বিজেপি'র ক্ষমতাসীন হওয়ার ঘটনা নিছক একটি বুর্জোয়া সরকারের পরিবর্তে আর একটি বুর্জোয়া সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর নয়। কারণ ফ্যাসিস্ট মতাবলম্বী আর এস এসের শাখা হিসাবে বিজেপির অবস্থান অন্য দলের থেকে আলাদা। বিজেপি পূর্বেও ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিল। কিন্তু সেই সময়কার বিজেপি পরিচালিত এন ডি এ সরকারের সঙ্গে বর্তমানের বিজেপি পরিচালিত এন ডি এ সরকারের পরিপ্রেক্ষিতগত পার্থক্য আছে। প্রথমত, বাজপেয়ী পরিচালিত প্রথম এন ডি এ সরকারে বিজেপি'র একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না, ফলে তাকে জোট শরিকদের উপর নির্ভর করে থাকতে হতো। এবারের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ভিন্ন। দ্বিতীয় এন ডি এ সরকার কার্যত বিজেপির সরকার। দ্বিতীয়ত, প্রথম এন ডি এ সরকারের সময় সংসদে বিরোধী দল হিসাবে কংগ্রেসের আসন সংখ্যা প্রায় বিজেপি'র সমান ছিল। কিন্তু এবারে উভয় দলের আসন সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য বিপুল। তৃতীয়ত, প্রথম এন ডি এ সরকারের আমলে আঞ্চলিক দলগুলি যারা প্রধানত ধর্মনিরপেক্ষ, তাদের সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এবারে চিত্রটা বিপরীত। ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবাংলার টিএমসি, ওড়িশার বিজেডি এবং তামিলনাড়ুর এ ডি এম কে বাদে অবশিষ্ট আঞ্চলিক দলগুলি অল্প সংখ্যক আসনে জয়ী হয়েছে। পূর্বোক্ত তিনটি দল উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আসনে জয়ী হলেও দীর্ঘসময় ধরে এরা বিজেপির সহযোগী ছিল। তাছাড়া এদের আসন সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হলেও জাতীয় রাজনীতিতে এরা কোনও ভূমিকাই পালন করতে পারবে না। সর্বোপরি প্রথম এন ডি এ সরকারের আমলে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রথম সারিতে থাকা বামপন্থীদের আসন সংখ্যা ছিল পঞ্চাশের বেশি। ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে বামপন্থীদের বিপর্যয় ঘটেছে যা ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির পক্ষে এক বড় বিপদ।

রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িকতার বিপদ বাড়ছে। সম্প্রতি দুটি বিধানসভার উপনির্বাচনের ফলাফল বিশেষভাবে ইঙ্গিতবহ। বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভার উপনির্বাচনে বামপন্থীদের শক্তিশালী ঘাঁটি গ্রামাঞ্চলে (যেখানে নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যাগরিষ্ঠ হল মুসলিম) তৃণমূল কংগ্রেস বিপুলভাবে জয়ী হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে বিজেপি'র বিপদ থেকে রক্ষা পেতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বামপন্থীদের নয়, তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে। আবার টাকি ও বসিরহাট শহরে (প্রধানত মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত) বিজেপি বিপুলভাবে জয়ী হয়েছে। উপনির্বাচনের এই ফলাফল আগামীদিনে এক অশুভ ইঙ্গিত বহন করছে। যে তৃণমূল কংগ্রেস দীর্ঘ ছয় বছর ধরে বিজেপি জোটে থেকে কেন্দ্রীয় সরকারে অংশ নিয়েছে, সেই তৃণমূল কংগ্রেসকেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িকতার বিপদে ত্রাতা বলে মনে করছে। অন্যদিকে মাত্র কয়েকমাস পূর্বে লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে এসে নরেন্দ্র মোদী 'দুই লাড্ডু'র গল্প শুনিয়ে ছিলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সেই বিজেপিকে ভরসা করছে শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত-উচ্চ-মধ্যবিত্ত-হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত নির্বাচকমণ্ডলীদের এক বড় অংশ।

সদ্য প্রয়াত ঐতিহাসিক অধ্যাপক ড. বিপান চন্দ্র তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ' গ্রন্থে সুপ্ত সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। যা মধ্যবিত্তদের পশ্চাদপদ অংশের মধ্যে থাকে। নির্বাচনের সময় সাম্প্রদায়িক ভোটের স্বার্থে একে উস্কে দেয়। আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও রাজ্য পরিস্থিতির এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের শামিল হতে হবে।

এক

সাম্প্রদায়িকতার প্রধান উপাদান তিনটি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ। মোকাবিলা প্রশাসনিকভাবে হয় না, একে মতাদর্শগতভাবে মোকাবিলা করতে হয়।

সাধারণভাবে দেখা যায় যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা উত্তেজনা ধর্মকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সাম্প্রদায়িকতার প্রধান কারণ ধর্ম। বস্তুতপক্ষে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ব্যক্তিগত স্তরেও দেখা গেছে যে ধার্মিক ব্যক্তি কখনোই সাম্প্রদায়িক হয় না, বিপরীতপক্ষে সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি কখনোই ধার্মিক হয় না। উদাহরণ স্বরূপ মহম্মদ আলি জিন্নার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। ইনি কোনোদিন কোরান পাঠ করেননি, মসজিদে যেতেন না, নামাজ পড়তেন না, অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের কোনও অনুশাসনই মানতেন না। অথচ তিনি হয়ে গেলেন ইসলাম ধর্মের সব থেকে বড় প্রবক্তা। 'ইসলাম বিপন্ন' শ্লোগান তুলে তিনি ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগের দাবি তুললেন। অন্যদিকে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ছিলেন একজন প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি। ইসলাম ধর্মের প্রতিটি অনুশাসন তিনি মেনে চলতেন। অথচ তিনি কিন্তু সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় লর্ড মাউন্টব্যাটনের প্রস্তাব অনুযায়ী ভারত ভাগের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন জওহরলাল নেহরু এবং তাঁকে সমর্থন করেছিলেন বল্লভভাই প্যাটেল। কিন্তু ভারত ভাগের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। একইভাবে বলা চলে যে গান্ধী ছিলেন হিন্দু ধর্মের একনিষ্ঠ সেবক। কিন্তু তিনি সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। যে কারণে তাঁকে আর এস এস কর্মীর গুলিতে প্রাণ দিতে হয়েছিল। আবার আদবানী, মুরলী মনোহর যোশীরা হিন্দু ধর্মের কোনও অনুশাসন না মানলেও তাঁরা হয়ে উঠেছেন হিন্দুত্বের সব থেকে বড় রক্ষক।

ধর্ম সম্পর্কে চলন্তিকায় বলা হয়েছে, ''ধর্ম হল সাম্প্রদায়িক উপাসনা পদ্ধতি, সংস্কার রীতি-নীতি, ঈশ্বর, পরকাল ইত্যাদি বিষয়ক।'' বস্তুতপক্ষে ধর্ম বিভিন্নভাবে সমাজকে প্রভাবিত করে। মানুষের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়। আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি, চলচ্চিত্র, ভাস্কর্য-এর অনেকটাই ধর্মীয় ঐতিহ্যের সাথে জড়িয়ে আছে। আমাদের অনেকের নামের সাথে দেব-দেবীর নামের মিল আছে। বিশ্বের তিনটি বৃহত্তম উৎসব খ্রীষ্টমাস, মহরম এবং দুর্গোৎসব-এর সাথে ধর্মের যোগ রয়েছে। ভারতে ছয়টি বৃহৎ ধর্মের সাথে যুক্ত সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর বাস রয়েছে। এর মধ্যে চারটি ধর্মের উৎসস্থল হল ভারতবর্ষ। ভারতে ২৯টি বড় ধর্মীয় সাংস্কৃতিক উৎসব রয়েছে।

সমাজতত্ত্ববিদ বা দার্শনিকরা ধর্মকে বাদ দিয়ে সমাজের বিকাশকে আলোচনা করেননি। বিভিন্ন দিক থেকে তাঁরা এই আলোচনা করেছেন। যেমন কোনও কোনও দার্শনিক মনে করেন যে প্রাক ধর্ম আদিম বিশ্বাস থেকে ধর্মের উৎপত্তি। দার্শনিক টাইটলার বা মুলার এই মতের প্রবক্তা ছিলেন। কোনও কোনও দার্শনিক ধর্মকে সামাজিক সংহতির বাহন রূপে দেখেছেন। ধর্মকে একটা অর্থনৈতিক সামাজিক ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছেন। মার্কস-এঙ্গেলস ছিলেন এই মতের প্রবক্তা। 'মার্কসের ক্যাপিটাল' এবং 'ইকনমিক অ্যান্ড ফিলজফিক্যাল ম্যানুস্ক্রিপ্ট' এবং এঙ্গেলসের 'অ্যান্টি ড্যুরিং' গ্রন্থ এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মার্কস বলেছেন ধর্ম হল 'হার্ট অব এ হার্টলেস ওয়ার্ল্ড', 'সোল অব এ সোললেস ওয়ার্ল্ড'। মার্কস-এঙ্গেলস তাঁদের লেখায় বিভিন্ন ধর্মের সমালোচনা করেছেন, কিন্তু কোনও ধর্মকে উৎকৃষ্ট, কোনও ধর্মকে নিকৃষ্ট—এইভাবে চিহ্নিত করেননি।

ধর্মের সাথে সাম্প্রদায়িকতার পার্থক্য রয়েছে। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ডঃ বিপান চন্দ্র লিখেছেন, সাম্প্রদায়িকতা হল এমন একটি বিশ্বাস যে একজন মানুষ একটি বিশেষ ধর্মে বিশ্বাস করলে তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক স্বার্থও এক ও অভিন্ন হয়। সাম্প্রদায়িকতাবাদ হল সেই বিশ্বাস যে বিশ্বাস অনুযায়ী ভারতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীশ্চান, শিখরা ভিন্ন ভিন্ন ও স্বতন্ত্র সম্প্রদায়, যারা স্বাধীনভাবে এবং স্বতন্ত্রভাবে বিন্যস্ত ও সংহত। এই বিশ্বাস অনুযায়ী একটি ধর্মের অনুবর্তীরা শুধুমাত্র ধর্মীয় স্বার্থেরই অংশীদার নন, বরং তাদের ধর্মনিরপেক্ষ স্বার্থ অর্থাৎ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক স্বার্থগুলিও অভিন্ন। বাংলাদেশের বিশিষ্ট বামপন্থী বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দিন ওমর তাঁর 'সাম্প্রদায়িকতা' গ্রন্থে লিখেছেন, ''কোনও ব্যক্তির মনোভাবকে তখনই সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া হয় যখন সে এক বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত তার ভিত্তিতে অন্য এক ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধাচরণ এবং তার ক্ষতিসাধন করতে প্রস্তুত থাকে। এক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির সাথে তার পরিচয় নাও থাকতে পারে, ব্যক্তি বিশেষ এক্ষেত্রে গৌণ।''

অর্থাৎ ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার পারস্পরিক তুলনা যদি আমরা করি তাহলে আমরা দেখবো যে, ধর্ম হচ্ছে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ অর্থাৎ একজন মানুষ ধর্মনিষ্ঠ মানে সেই ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই এই ধর্মনিষ্ঠা গড়ে উঠেছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে সম্প্রদায়গত বা গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক যুক্ত, এখানে ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ নয়। দ্বিতীয়ত, বদরুদ্দিন ওমরের ভাষায় ধর্ম হচ্ছে পরকালের ব্যাপার, ইহকালের কোনও ব্যাপার নয়। একজন ব্যক্তি এই কারণে ধর্মাচরণ করে যে তার ধারণা পরজন্মে সে সুখে থাকবে। অর্থাৎ ফলাফল এখুনি পাওয়া যায় না। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতাবাদ গোটাটাই হচ্ছে ইহকালের ব্যাপার, এর সাথে পরজন্মের কোনও বিষয় নেই। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সবসময়ই আশু ফলাফল চায়। অর্থাৎ ধর্ম যেখানে (যারা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাস করে) পরকালের ব্যাপার, সাম্প্রদায়িকতাবাদ সেখানে ইহকালকে সূচিত করেই গড়ে উঠেছে। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, মানব সমাজের জন্মলগ্ন বা তার কিছু পর থেকেই ধর্মের উদ্ভব। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা একেবারেই আধুনিক বিষয়।

এক্ষেত্রে ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ আলোচনা করা যেতে পারে। ভারতে ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম শাসকদের শাসনব্যবস্থা চালু ছিল। সেই সময় বিশেষত ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে হিন্দু রাজাদের সাথে মুসলিম নবাবদের ক্ষমতার লড়াই হয়েছে কিন্তু কখনোই তা হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গায় পরিণত হয়নি। বস্তুতপক্ষে ভারতে সাম্প্রদায়িকতাবাদের উৎপত্তি— ব্রিটিশ আমলে। জওহরলাল নেহরু তাঁর 'ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া' গ্রন্থে এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন। ''এটা নিশ্চয়ই আমাদের দোষ, এই দোষের কর্মফল আমাদের ভোগ করতেই হবে। তবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতে সুচিন্তিতভাবে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে যেভাবে তা লালন পালন করেছে তার জন্য তাদের আমি কখনোই ক্ষমা করতে পারব না। আমাদের উপর বড় আঘাত এসেছে, তা আমরা সামলে নিয়েছি। কিন্তু ব্রিটিশের কল্যাণে প্রাপ্ত এই যে সাম্প্রদায়িকতা ভেদবুদ্ধির ক্ষত তা বহুকাল আমাদের জাড়িত করতে থাকবে। সুতরাং সাম্প্রদায়িকতাবাদকে যদি ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করি তাহলে দেখবো যে, এটা একেবারে আধুনিক বিষয় এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতে আসার পরই এর জন্ম।''

ব্রিটিশ ভারতে তিনটি বিষয়কে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জন্মের পর থেকে প্রেক্ষাপট বলে মনে করা হয়। প্রথমত, ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর মধ্য দিয়ে যে ভূমি সম্পর্ক তৈরি হয়, তার মধ্য দিয়ে বঙ্গ দেশে জমিদার বা জমির মালিকদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু এবং অন্যদিকে ক্ষেতমজুর বা ভাগচাষীদের সিংহভাগ ছিল মুসলমান। ফলে জমিদারদের সাথে যখন কৃষি মজুরি বা ফসলের অংশ নিয়ে লড়াই হয়েছে, তখন অনেক ক্ষেত্রেই তাকে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ১৮৩৫ সালে লর্ড মেকলে যে শিক্ষানীতি চালু করে তা মুসলিমরা অনেক দেরি করে গ্রহণ করায় ইংরেজি এবং সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজ অনেক পিছিয়ে পড়ে। ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আর্থ সামাজিক স্তরে সৃষ্টি হয় এক বিপুল বৈষম্য। তৃতীয়ত, ইতিহাসের সাম্প্রদায়িকীকরণ ভারতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাকে উভয় সম্প্রদায়ের ইতিহাসবিদরা নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বা মতাদর্শ তার ভিত্তিকে খুঁজে পেয়েছে। সর্বোপরি এসবের উপর ভিত্তি করেই ব্রিটিশ শাসকরা তাদের 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' বা 'ভেদ কর ও শাসন কর' নীতিকে চালিয়ে গেছে, যা এখন সংঘ পরিবার 'ডিভাইড এ্যান্ড উইন' এই নীতিতে পরিণত করেছে।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মূল আশু লক্ষ্য হল ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠিত করা। কংগ্রেস বা বিভিন্ন বুর্জোয়া দলের কাছে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হল সমস্ত ধর্মকে মদত দেওয়া। কিন্তু ধর্মের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িকতাবাদ উৎসাহিত হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত অর্থ হল ধর্মকে রাষ্ট্র ও রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করা। এর মধ্য দিয়েই প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সরকারী অনুষ্ঠানে ধর্মীয় আচার, অনুষ্ঠান করা, প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার উপর আক্রমণের আর একটি ক্ষেত্র। সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন, কারণ এটি তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু যদি তাঁর এই ধর্মাচরণ সরকারী প্রচার-মাধ্যমে প্রচার করা হয়, তা ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিকে আঘাত করে।

দুই

বর্তমান জাতীয় রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টি যে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু ফ্যাসিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী চরম দক্ষিণপন্থী হিন্দুত্ববাদী আর এস এস পরিচালিত বিজেপি শুধু সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতিতেই দক্ষ তাই নয়, আর্থ রাজনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রেও তারা এক চরম প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির প্রবক্তা।

আর্থিক নীতির প্রশ্নে তারা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও সরকারী কাজের বেসরকারীকরণের জোরালো সমর্থক। বিজেপি পরিচালিত প্রথম এন.ডি.এ. সরকার মডার্ণ ফুডস, বালকো এবং সেন্টুর হোটেল সহ একাধিক সরকারী হোটেল জলের দামে বিক্রি করে দেয়। এবারেও প্রথম ছয় মাসের শাসনে রেল, প্রতিরক্ষা, বীমা, ব্যাঙ্ক ব্যবসায় বেসরকারীকরণ ও বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশকে নিশ্চিত করতে উদ্যোগী হয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের ঐতিহ্যশালী প্রতিষ্ঠান আই সি এইচ আর-এর শীর্ষ পদে একজন হিন্দুত্ববাদীকে বসানো হয়েছে।

দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে একটি কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে বিজেপি সওয়াল করে। এল. কে. আদবানি একটি প্রবন্ধে ভারতে ৬০টি রাজ্য গঠনের পক্ষে সওয়াল করেছেন। ছোট ছোট রাজ্য মানে শক্তিশালী কেন্দ্র। আর শক্তিশালী কেন্দ্র হলে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও লগ্নীপুঁজির শোষণের পক্ষে তা অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

বিজেপির পররাষ্ট্র নীতি হল চরম দক্ষিণপন্থী। তারা আমাদের দেশের জোট নিরপেক্ষতাকে বিসর্জন দিয়ে, স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতির পরিবর্তে মার্কিন স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের পররাষ্ট্র নীতিকে গড়ে তুলতে চায়। তাছাড়া জায়নবাদী ইজরায়েলী সরকারের সাথে বিজেপি সরকার সুমধুর সম্পর্ক গড়ে তোলার পক্ষপাতী। এই কারণে বিগত জুলাই-আগস্ট মাসব্যাপী যখন গাজা ভূখণ্ডে ইজরায়েলী হানায় শত শত শিশু সহ কয়েক হাজার মানুষ নিহত হয়, তখন সংসদে এর বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব আনা এবং ভারত ইজরায়েল সামরিক অস্ত্র চুক্তি বাতিলের যে প্রস্তাব বামপন্থীরা এনেছিল, তা গ্রহণ করা হয়নি।

আর এস এস-বিজেপি চক্র ভূমি সংস্কারে বিশ্বাসী নয়। কৃষিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ভিত্তিক সম্পত্তি সম্পর্ককে বজায় রেখেই, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে কৃষিতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করতে চায়।

পূর্বোক্ত আলোচনার পটভূমিতে একথা বলা চলে যে, কেন্দ্রে বিজেপি পরিচালিত জোট সরকার দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা, অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, স্বাধীন, জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি এবং মানবাধিকারের সামনে এক বড় বিপদ। এর মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে এক চরম দক্ষিণপন্থার বিপদ সমুপস্থিত। বামপন্থী ও সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির গণতান্ত্রিক জোটই পারে এই মহা-বিপদ থেকে দেশকে উদ্ধার করতে এবং তীব্র শ্রেণী ও গণআন্দোলনের মধ্য দিয়েই তা সম্ভব। □

তৃতীয় পৃষ্ঠার পরে

কেন্দ্রীয় বাজেট-২০২৫-২৬ ঃ শ্রেণী স্বার্থের উৎকট প্রদর্শন

হচ্ছে মধ্যবিত্ত এক অংশের হাতে যারা জনগণের মাত্র ৩.৮ শতাংশ। অর্থাৎ বিপুলসংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমিয়ে স্বল্পসংখ্যক মধ্যবিত্তের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে। অর্থাৎ শ্রেণীগতভাবে ক্রয়ক্ষমতার পুনর্বণ্টন হচ্ছে বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের হাত থেকে সামান্য কিছু মধ্যবিত্ত অংশের হাতে। এর একটা সরাসরি ফল হল ক্ষুদ্র উৎপাদনের পণ্য বিক্রি হ্রাস (শ্রমজীবী মানুষ এদের উৎপাদিত পণ্যই কেনে) এবং তার বদলে একচেটিয়া পুঁজির পণ্য বিক্রির বৃদ্ধি (মধ্যবিত্ত অংশ এদের পণ্যই বেশি কেনেন)। ফলে একচেটিয়া পুঁজি এই পদক্ষেপে খুশি হবে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ভারতীয় অর্থনীতির চাহিদা সামান্যতমও বৃদ্ধি হবে না।

২০২৪-২৫-এর বাজেটের কতকগুলি ক্ষেত্রে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে—মূলত নন-ট্যাক্স রিসিপ্ট। স্পেক্ট্রাম বিক্রি করে এই অর্থবর্ষে ১.২৩ লক্ষ কোটি টাকা উপার্জন হয়েছে, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা থেকে ডিভিডেন্ড পাওয়া গেছে ৫৫,০০০ কোটি টাকা, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া থেকে ২.৩ লক্ষ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত পাওয়া গেছে। এভাবে প্রায় পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা উপার্জন হয়েছে। ২০২৫-২৬-এর বাজেটেও এইসব খাত থেকে এরকম রাজস্ব আদায় হবে বলে হিসেব করা হচ্ছে। কিন্তু সাধারণত তা হয় না, অর্থাৎ এসব খাত থেকে এভাবে সমপরিমাণ বৃদ্ধি নাও হতে পারে।

অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল রাজকোষ-ঘাটতি ও জি.ডি.পি-এর অনুপাত। ২০২৩-২৪ সালে এই অনুপাত ছিল ৫.৬ শতাংশ; ২০২৪-২৫-এ ৪.৮ শতাংশ এবং ২০২৫-২৬ সালে তা আরও কমে দাঁড়িয়েছে ৪.৪ শতাংশে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার বৃদ্ধির তুলনায় তার সামগ্রিক খরচ ক্রমাগত কমিয়ে চলেছে। এইরকম অবস্থায় যদি সরকারের নন-ট্যাক্স রেভিনিউ প্রত্যাশিত ভাবে না ওঠে তবে সামাজিক ক্ষেত্রে সরকার তার খরচ আরও কমাবে, অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষের চাহিদা আরও সঙ্কুচিত হবে।

পাশাপাশি এবারের বাজেটে বড়লোকদের উপর কোনোরকম ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হয়নি—না কর্পোরেশন ট্যাক্স না ওয়েলথ ট্যাক্স। অথচ দুইশো জন ভারতীয় বিলিওনিয়ার অভাবনীয় মুনাফা করছে এই সময়কালে। ভারতের সর্বোচ্চ বড়লোকদের প্রথম ১ শতাংশের উপর অন্তত ২ শতাংশ সম্পদ কর বসালে বাজেটের খরচের বড় অংশই উঠে আসতো।

এই প্রেক্ষাপটে বামপন্থীরা একটি বিকল্প বাজেট প্রস্তাব করেছে, যার মূল দাবীগুলি হল—(i) দেশের ২০০ বিলিওনিয়ারদের উপর ৪ শতাংশ হারে সম্পদ কর চালু করতে হবে, কর্পোরেট কর বৃদ্ধি করতে হবে; (ii) ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের আইনি স্বীকৃতি সুনিশ্চিত করতে হবে; (iii) বিমা ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বেসরকারীকরণ ও ন্যাশনাল মনিটাইজেশন পাইপলাইনের মাধ্যমে সরকারী সম্পদকে বেসরকারী হাতে তুলে দেওয়া বন্ধ করতে হবে; (iv) রেগায় ৫০ শতাংশ বরাদ্দ বৃদ্ধি, শহরে কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত আইন চালু, বার্ধক্য ভাতার কেন্দ্রীয় অংশ সহ অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষায় বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। (v) স্বাস্থ্যে জিডিপি-র ৩ শতাংশ এবং শিক্ষায় ৬ শতাংশ বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে; (vi) গণবণ্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে খাদ্যে ভর্তুকি বৃদ্ধি করতে হবে; (vii) তফশিলি জাতি, আদিবাসীদের পাশাপাশি মহিলা ও শিশুকল্যাণ খাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে, এরই সঙ্গে অঙ্গনওয়াড়ি খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং প্রকল্প কর্মীদের ভাতার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের অংশ বাড়াতে হবে; (viii) রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে কর সংক্রান্ত হস্তান্তর এবং কেন্দ্র পোষিত প্রকল্পে তহবিল বৃদ্ধি, পেট্রোলিয়াম পণ্যে সেস ও সারচার্জ বন্ধ করতে হবে।

এই দাবিগুলিকে নিয়ে আমাদের অফিসে অফিসে প্রচার, আন্দোলন চালাতে হবে মধ্যবিত্ত কর্মচারী সমাজের মধ্যে যাতে তাদের উপলব্ধিতে আনা যায় রাজনৈতিক তাৎক্ষণিক ফল লাভের জন্য (দিল্লি ও বিহারের ভোট) কীভাবে ভারতের অর্থনীতির ভিত্তিকে দুর্বল করা হচ্ছে; কীভাবে একচেটিয়া পুঁজিকে খুশি করতে শুধুমাত্র কিছুপ্রসাধনী পরিবর্তন করে মূলত শ্রমজীবী মানুষের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে। □

চতুর্থ পৃষ্ঠার পরে

ভাষা আন্দোলন ও আজকের বাংলাদেশ

সালে ছিল তিন হাজারের কিছু বেশি। বর্তমানে এমন অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ১,১৩, ৫৮৬টি।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির মূলে ছিল পোশাক রপ্তানি। ২০২৩ সালেও বাংলাদেশকে বলা হত রপ্তানি কেন্দ্রীক বিকাশের পোষ্টার বয়। রপ্তানির ওপর নিভর করে জিডিপি-র হার বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এর সুযোগ ভোগ করেছে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি। যাদের অবস্থান ছিল শেখ হাসিনার ঘনিষ্ট বৃত্তে। হাই-নেট ওয়ার্থ ব্যক্তির বৃদ্ধির হারে বাংলাদেশ ছিল তৃতীয়। অপরদিকে ১ কোটি ৮০ লক্ষ তরুণ-তরুণীর কোনো কাজের সুযোগ ছিল না। ২০২৩ সালে কাজের সন্ধানে দেশ ছেড়েছে ১৩ লক্ষ কর্মপ্রার্থী যুবক-যুবতী। প্রতি ঘণ্টায় ১৫০ জন। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে দুর্নীতি।

বিশ্বের পোশাক শিল্পের চাহিদার ১০ শতাংশ পূরণ করত বাংলাদেশ। কিন্তু কোভিডের সময় এই রপ্তানি শিল্পে ধাক্কা লাগে। অপরদিকে বিদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশের নাগরিকদের পাঠানো অর্থের পরিমাণও হ্রাস পেতে থাকে। পাশাপাশি আমদানি নির্ভর জ্বালানির খরচ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বৃদ্ধি পাওয়ায়, বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয়ে টান পড়ে। দেশের অভ্যন্তরে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি পায়। পাল্লা দিয়ে বাড়ে লোডশেডিং। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের মুদ্রাস্ফীতির হার দাঁড়ায় ৯.৫২ শতাংশ। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অস্থিরতার অন্যতম কারণ অর্থনীতির এই অধোগতি।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে দুটি ধারা—এর একটি ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারা। যার প্রতিনিধিত্ব করে আওয়ামি লীগ। অপর ধারাটি ধর্মাশ্রয়ী জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রতীক। যার মূল প্রতিনিধি বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্টি (বিএনপি)। আওয়ামি লীগ ও বি এন পি দুটি দলই সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে, লুটেরা ধনিক শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধি এবং দুর্নীতিগ্রস্ত। বি এন পি জামাতের মতো সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে। আওয়ামি লীগ অসাম্প্রদায়িক হলেও, সাম্প্রদায়িকতার সাথে আপস করে। জামাতের মতোই ব্লাসফেমি অর্থাৎ ধর্মীয় অনুশাসনের কথা বলা জেনারেল এরশাদের জাতীয় পার্টির সাথে নির্বাচনী আঁতাত করে।

চীন ও ভারত উভয় দেশের সাপেক্ষে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও চুপ করে বসে নেই। ঘোলা জলে মাছ ধরার জন্য নেমে পড়েছে। দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক মার্কিন সহ-সচিব ডোনাল্ড লু মে মাসে বাংলাদেশ সফর করেন। আলেবেনিয়া, জর্জিয়া, আজারবাইজান, কিরঘিজিস্তান প্রভৃতি দেশে রঙীন বিপ্লবে ইন্ধন যোগানোর রেকর্ড রয়েছে ডোনাল্ড লু-র। ফলে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। শেখ হাসিনা অভিযোগ করেছিলেন, একটি বিদেশী শক্তি বাংলাদেশের একটি অংশে নিয়ন্ত্রণ চায়। ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা রশিদ খান যেমন সরাসরি বলেছেন, বাংলাদেশের চট্টগ্রামের সেন্ট মার্টিন দ্বীপে (প্রবাল দ্বীপ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বায়ু সেনা ঘাঁটি নির্মাণ করতে চায়। বাংলাদেশকে 'কোয়াডের' অন্তর্ভুক্ত করার অভিসন্ধিও বাংলাদেশের রয়েছে।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ও তার গতিপ্রকৃতির প্রভাব পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে পড়ছে। ওদেশে মৌলবাদের দাপট বৃদ্ধি পেলে, উৎসাহিত হবে এই রাজ্যের সাম্প্রদায়িক শক্তি। সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা বৃদ্ধি পেলে তা থেকে ফায়দা লুটতে চাইবে রাজ্যের শাসকদলও। ফলে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহ্য বহনকারী ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী চেতনার পুনর্জাগরণই উভয় বাংলায় শান্তি ও সম্প্রতি সুনিশ্চিত করবে। □

দিশাহীন রাজ্য বাজেট ২০২৫

বিদ্যুত দাস

আগামী ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে শেষ পূর্ণাঙ্গ রাজ্য বাজেট পেশ হল গত ১২ ফেব্রুয়ারি। ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বাজেটের মোট প্রস্তাবিত বরাদ্দ / ব্যয় ৩,৮৯,১৯৪.০৯ কোটি টাকা। এই অর্থ সংগ্রহ করা হবে ১ লক্ষ ১৩ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব সংগ্রহ করে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ১ লক্ষ ৭ হাজার কোটি টাকা রাজস্বের ভাগ সংগ্রহ করা হবে, ৩৭ হাজার কোটি টাকার অনুদান নেওয়া হবে এবং ১ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ নেওয়া হবে। বাজার থেকে চড়া সুদে ঋণ নেওয়া হবে ৮২ হাজার কোটি টাকা। রাজ্যের প্রস্তাবিত রাজস্ব আয়ের মধ্যে মদ বিক্রি করে আসবে ২২ হাজার ৫৫০ কোটি টাকা (১৯.৯১ শতাংশ)। রাজ্যে মদের ফোয়ারা ছুটিয়ে এই রাজস্ব সংগ্রহ করা হবে। রাজ্যে মদ বিক্রির তথ্যে উঠে এসেছে, গত ২০১০-২০১১ অর্থবর্ষে (বামফ্রন্ট সরকারের সময়) মদ বিক্রি হয়েছে ২৪৮১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে প্রস্তাবিত আয় ৮৩৩ শতাংশ বাড়বে (২২,৫৫০ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা) মদ বিক্রি করে। রাজ্যে মদের দোকান আছে ৭৭৪৬টি। মদের দোকান আরো বাড়ানোর জন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

রাজ্য বাজেটে প্রস্তাবিত আয়ের একটা অংশ হল বাজার থেকে ঋণ গ্রহণ। ৮২ হাজার কোটি টাকা বাজার থেকে ধার করবে সরকার। গত আর্থিক বছরে ধার করেছিল ৮০ হাজার কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, "আমরা যখন এসেছিলাম তখন বিশাল লোন ছিল।" কিন্তু তথ্য বলছে, ২০১১ সালে যখন সরকার পরিবর্তন হল তখন রাজ্যের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ১,৯২,৯১৯ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। চলতি আর্থিক বছরে দাঁড়িয়েছে ৭,০৬,৫৩১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা। রাজ্যের জনসংখ্যা প্রায় ১০ কোটি। রাজ্যবাসীর মাথা পিছু ঋণ বর্তমানে ৭০,৬৫৩ টাকা। আগামী ৩১ মার্চ, ২০২৬ রাজ্যে ঋণের পরিমাণ দাঁড়াবে ৭,৭১,৬৭০ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ২০১১-র মে থেকে ২০২৫-র মার্চ পর্যন্ত রাজ্যের ঋণ বেড়েছে ৫,১৩, ৬১১ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা।

বেকারদের কর্মসংস্থান নিয়ে কার্যত নীরব থেকেছে রাজ্য বাজেট। পশ্চিমবঙ্গে বেকারি বৃদ্ধি, শিল্প কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া, পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে অন্য রাজ্যে চলে যাওয়া, রাজ্যে সরকারী ক্ষেত্রে ৭ লক্ষ শূন্যপদ পূরণ প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট কোনো বক্তব্য বাজেটে নেই। বিগত রাজ্য বাজেটে সরকারী ক্ষেত্রে ১০ লক্ষ চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। সেই ঘোষণা কার্যকরী তো হয়ইনি উপরন্তু মহামান্য উচ্চ আদালতের নির্দেশকে উপেক্ষা করে স্থায়ী পদে অস্থায়ী, চুক্তিতে নিয়োগ করা হয়েছে।

সম্প্রতি রাজ্যে অষ্টম বাণিজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যে ১৩ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু এই সম্পর্কে বাজেটে কিছুই বলা হয়নি। এই বাণিজ্য সম্মেলনে আরো দাবি করা হয়েছিল ২১২টি সমঝোতা চুক্তি হয়েছে এবং ৪ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে। কিন্তু বিগত সম্মেলনগুলির পর রাজ্যে কতজনের কর্মসংস্থান হয়েছে তা বাজেটে বলা হয়নি।

আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও পেনশনারদের জন্য মাত্র ৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা / রিলিফ ঘোষণা করা হয়েছে। প্রাপ্তির চেয়ে বঞ্চনার পরিমাণ অনেক বেশি। বকেয়া পরিমাণ ৩৫ শতাংশ। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা থেকে রাজ্য কর্মচারীদের বঞ্চিত করার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করেছে মামলা লড়ার জন্য। বাজেট বিবৃতিতে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ১২৫ শতাংশ ডিএ দিয়ে বেতন কমিশন কার্যকরী করা হয়েছে এবং অদ্যাবধি ১৮ শতাংশ ডিএ/রিলিফ দেওয়ায় রাজ্যের কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের থেকে বেতন বেশি পায়। এই বক্তব্য সঠিক নয়। ঘটনা হল, কেন্দ্রীয় সরকার এবং অন্যান্য প্রায় সমস্ত রাজ্য সরকার ১২৫ শতাংশ ডিএ যুক্ত করে পে কমিশন কার্যকর করেছিল ১.১.২০১৬ থেকে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পে কমিশন কার্যকর করে ১.১.২০২০ থেকে। মাঝের ৪ বছরে ৪১ শতাংশ ডিএ রাজ্য সরকার কর্মচারীদের দেয়নি।

রাজ্য বাজেটে দাবি করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির পুনর্জাগরণ ঘটেছে। কিন্তু বাস্তবতা এই বক্তব্যের বিপরীত। জাতীয় স্তরে যেমন অর্থনৈতিক বৃদ্ধির অধোগতি ঘটেছে (৮.৪ শতাংশ থেকে কমে ৬.৪ শতাংশ হয়েছে) তেমনি আমাদের রাজ্যেও অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ৭.৬ শতাংশ থেকে নেমে ৬.১ শতাংশ হয়েছে। রাজ্যে বিগত অর্থ বর্ষ থেকে ঘরোয়া উৎপাদন কমেছে (GDP) ৬৪,৪৪৩ কোটি টাকা।

মোট ঘরোয়া উৎপাদনে (Debt to GSDP) সরকারী ঋণের অনুপাত (৩৭ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৩৯ শতাংশ) দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (পাঞ্জাব প্রথম)।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হার গত ১২ বছরে হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৪.৭ শতাংশ, যেখানে জাতীয় বৃদ্ধির হার ছিল ৬ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের মাথাপিছু বার্ষিক আয় (১,৫৪,১১৯ টাকা) যা জাতীয় মাথাপিছু আয়ের (১,৮৪,২০৫ টাকা) তুলনায় ৩০ হাজার টাকা কম। ২০০৪-০৫ সালে মাত্র ২ হাজার টাকা কম ছিল।

কৃষিতে পিছিয়ে পড়েছে রাজ্য। ধান উৎপাদনে দেশের মধ্যে তৃতীয় (প্রথম তেলেঙ্গানা, দ্বিতীয় উত্তরপ্রদেশ)। ২০১০-১১ পর্যন্ত শীর্ষে ছিল পশ্চিমবঙ্গ। মোট খাদ্য শস্য উৎপাদনে আমাদের রাজ্য বর্তমানে সপ্তম। মাছ উৎপাদনে পিছিয়ে গেছে। অন্ধ্রপ্রদেশের মাছ খাচ্ছে বাংলার মানুষ।

পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু মাসিক খরচের হিসেবে দেশের মধ্যে ১৮টি বড় রাজ্যের মধ্যে ১৩তম স্থানে। পশ্চিমবঙ্গে গ্রামাঞ্চলে মাসিক মাথাপিছু খরচ ৩৬২০ টাকা (জাতীয় গড় ৪১২২ টাকা) এবং শহরাঞ্চলে ৫,৭৭৫ টাকা (জাতীয় ৬,৯৯৬ টাকা)। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সহ বিভিন্ন প্রকল্পের বহু প্রচার সত্ত্বেও দারিদ্র্যের এই চিত্র আড়াল করা যাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গে স্বনিযুক্ত শ্রমজীবীদের গড় মাসিক আয় ১৬,৬৫০ টাকা (যেখানে সারা দেশে গড় আয় মাসিক কুড়ি হাজার টাকার বেশি)। পশ্চিমবঙ্গে বেকারত্ব বেশি বলেই শ্রমজীবীদের গড় আয় জাতীয় গড় আয়ের তুলনায় কম।

এম এন রেগা ও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় কেন্দ্রীয় বরাদ্দ গত তিন বছর বন্ধ আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য রাজ্যে দুর্নীতি হচ্ছে, বরাদ্দকৃত অর্থের খরচের হিসাব দেয়নি রাজ্য। রাজ্য সরকার। কেন্দ্রের থেকে বকেয়া অর্থ আদায়ে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এমন তথ্য যেমন নেই, তেমনি রাজ্য সরকার শ্বেতপত্র প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনও গড়ে তুলছে না। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে তোলা দুর্নীতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। মাঝখান দিয়ে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন। রাজ্যের মানুষ উভয় সরকারকেই কর দেন, সম্পদ সৃষ্টি করেন—তাদের বঞ্চিত করার অধিকার কোনো সরকারের নেই। এই পারস্পরিক বোঝাপড়ার বিরুদ্ধে সর্বস্তরে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন।

পাশাপাশি ভোটের রাজনীতির জন্য একশো দিনের কাজের পরিবর্তে 'কর্মশ্রী প্রকল্প' এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার পরিবর্তে 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্প চালু করে রাজ্য সরকার। রাজ্যের আবাস যোজনায় যেমন দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে তেমনি, 'কর্মশ্রী' প্রকল্পের ৬১ কোটি কর্মদিবস সৃষ্টি করেছে বলে দাবি করেছে রাজ্য সরকার যার সঙ্গে বাস্তবতার মিল নেই।

নদী বন্ধন প্রকল্পে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ঘোষণা করা হয়েছে বাজেটে। নদী ভাঙন রোধে মাস্টার প্ল্যানের জন্য বরাদ্দেরও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু নদী বন্ধন প্রকল্পের কোনো Detailed Project Report (DPR) সম্পর্কে সরকার কিছু জানায়নি। নদী সংযোগে পরিবেশের উপর ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়তে পারে, নদী থেকে অপরিকল্পিত খনিজ উত্তোলনের উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকলে নদী কেন্দ্রিক বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস হতে পারে বলে পরিবেশবিদদের আশঙ্কা।

রাজ্য বাজেটে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অব্যবস্থা দূর করতে স্কুলে ড্রপ আউট বন্ধ করবে, রাজ্যে ভেঙে পড়া গণপরিবহন ব্যবস্থা সম্পর্কে নীরব থেকেছে।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে অনুদানের অর্থ বৃদ্ধি না পাওয়া এবং আশা কর্মীদের ভাতা বৃদ্ধি না পাওয়ায় ক্ষোভ লক্ষ করা গেছে। কৃষক বন্ধু (নতুন), স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, সবুজ সাথী প্রকল্পগুলিতে এবং ক্ষুদ্র-ছোট ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্রে (এম এস এম ই) ক্ষেত্রে বরাদ্দ কমানো হয়েছে।

সম্প্রতি সংসদে পেশ হওয়া কেন্দ্রীয় বাজেটে যেভাবে স্বপ্নের পোলাও-এ প্রচুর ঘি ঢালা হয়েছে, ঠিক তেমনি আমাদের রাজ্যের বাজেটও সেই পথ অনুসরণ করেছে। এটাই স্বাভাবিক কারণ যে দুটি সরকারই লুটেরা পুঁজির পৃষ্ঠপোষক। রাজ্যে গত ১৪ বছর অনেকবার শিক্ষা সম্মেলন, শিল্প সম্মেলন ইত্যাদির হুল্লোড় হলেও দেশের মধ্যে এই রাজ্য ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণের কথা ফলাও করে প্রচার করলেও সুনির্দিষ্ট কোনো দিশা দেখাতে পারেনি রাজ্য বাজেটে। দিশাহীন, শ্রমিক কর্মচারী স্বার্থ বিরোধী বাজেটের বিরুদ্ধে সর্বত্র প্রচার, আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে আমাদের। □

প্রণব দা... কমরেড প্রণব চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবাংলার মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলনের অন্যতম সুপরিচিত নেতৃত্ব কমরেড প্রণব চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পরে গত ২৪ জানুয়ারি প্রয়াত হয়েছেন। জীবনের শেষ দুটি বছর (২০২৩, ২০২৪) বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার কারণেই তিনি কার্যত গৃহবন্দী হয়ে পড়েন। সংগঠন, আন্দোলন-সংগ্রামের বৃত্ত থেকে বেশ কিছুটা দূরে সরে যেতে বাধ্য হন। অথচ ২০২২ সালেও তিনি বহুবিধ রাজনৈতিক-সাংগঠনিক দায়িত্ব দক্ষতার সাথে সামলেছেন। এই সময় বিভিন্ন শারীরিক প্রতিবন্ধকতাজনিত সমস্যার মুখোমুখি হয়েও, তাকে অতিক্রম করেই তিনি সক্রিয় ছিলেন। সহযোদ্ধারা তাঁর শারীরিক সমস্যা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিলে বা উদ্বেগ প্রকাশ করলে, তাঁর সহাস্য জবাব ছিল—বয়স শরীরে থাবা বসালেও, মাথাটা পূর্ণমাত্রায় সচল রয়েছে। অতএব চিন্তার কোনো কারণ নেই। মনের জোরে একথা বললেও, কিছুদিন পরেই বোঝা গেল, শারীরিক সমস্যা বৃদ্ধির কারণেই 'মস্তিষ্কও ততটা সচল থাকতে পারছে না। ফলত যে দুটি গুণের জন্য (ক্ষুরধার লেখনী ও বাগ্মিতা) প্রণবদা মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলনের বাইরে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিসরেও অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, সেখানেই ঘাটতি শুরু হয়ে গেছিল। চিকিৎসকদের প্রচেষ্টা তো ছিলই, পাশাপাশি নিজেও জেদের অস্ত্র দিয়ে মাথাটাকে আগের মতো সচল করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পারেননি। শেষ কয়েকমাস একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন।

এই সময়টায় তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ট বৃত্তে থাকা আমাদের কয়েক জনকেও অস্বস্তি ও কষ্ট মিশ্রিত এক ধরনের অনুভূতি গ্রাস করেছিল। প্রণবদা রয়েছেন, অথচ তাঁর হাত থেকে লেখা বেরোচ্ছে না, অথবা মৌলিক বা সমসাময়িক কোনো বিষয়ে সভা-সেমিনারে তিনি বক্তৃতা দিচ্ছেন না—এটা মেনে নেওয়াই খুব কঠিন হচ্ছিল আমাদের পক্ষে। প্রণবদাকেও এক ধরনের হতাশা গ্রাস করছিল। তাঁর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার জন্য যখন আমরা ফোন করতাম, বা তিনি কখনও কখনও ফোন করতেন—অল্প দু-চারটে কথার মধ্যেও হতাশা স্পষ্ট ধরা পড়ত। বয়সজনিত সমস্যার কারণে ব্যাপারটা খুব অস্বাভাবিক না হলেও, আমাদের পক্ষে প্রণবদা বলেই মেনে নেওয়া কঠিন হচ্ছিল।

দুই

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয় ১৯৭১ সালে। ১৯৮১ সালে সংগঠনের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রথম বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১৯৮৬ সালে মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত সপ্তম রাজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতি পর্বে সিদ্ধান্ত হয়, রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হবে। সেই সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা আজও বজায় রয়েছে। সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশনার জন্য 'এডিটোরিয়াল বোর্ড' দায়িত্ববদ্ধ। কিন্তু বিশেষ সংখ্যা প্রকাশনা উপলক্ষে স্থায়ী এডিটোরিয়াল বোর্ডে অতিরিক্ত কয়েকজনকে যুক্ত করা হয়। যাঁদের যুক্ত করা হয়, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ রাজ্য সম্মেলন পরবর্তী নবগঠিত এডিটোরিয়াল বোর্ডে যুক্ত হন। আবার কেউ কেউ তাঁদের পূর্বতন সাংগঠনিক দায়িত্বে ফিরে যান।

১৯৯২ সালে দশম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের জন্য এডিটোরিয়াল বোর্ডে বেশ কয়েকজনকে যুক্ত করা হয়। আমিও সেই সময়েই সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার প্রকাশনার কাজে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাই। শুভাশীষ গুপ্ত তখন সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার সম্পাদক। প্রণব চট্টোপাধ্যায় ও দেবু দত্তগুপ্ত ছিলেন সহযোগী সম্পাদক। এই দুজনেই পরবর্তীকালে মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলনে আকর্ষণীয় বাগ্মীতা ও ক্ষুরধার লেখনীর জন্য বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছিলেন। যদিও দশম রাজ্য সম্মেলনের পরে দেবু দত্তগুপ্ত আর সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার সাথে যুক্ত থাকেননি। তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি (W.B.M.O.A.)-এর মুখপত্র

বক্তা কমরেড প্রণব চট্টোপাধ্যায়..... স্মৃতির সরণী বেয়ে

সমন্বয় প্রকাশনার দায়িত্ব নেন। ঐ সম্মেলন থেকে প্রণব চট্টোপাধ্যায় সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচিত হন। রাজ্য সম্মেলনের পরে পত্রিকার এডিটোরিয়াল বোর্ড নতুন করে গঠিত হলে, আমার সেখানে যুক্ত হওয়ার সুযোগ হয়। স্বভাবতই শুভাশীষদার নেতৃত্বে বিশেষ সংখ্যার জন্য কিছুদিন কাজ করার সুযোগ হলেও, আমার পত্রিকা-সাংগঠনিক জীবন শুরু হয় মূলত প্রণবদার নেতৃত্বে।

সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে যখন আমাকে যুক্ত করা হয়, তখন কর্মচারী আন্দোলন তথা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে আমার অভিজ্ঞতার পুঁজি সামান্যই। চাকরি জীবনে তখন মাত্র বছর দু'য়েক পার করেছি। স্বভাবতই এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়ে আনন্দ যেমন হয়েছিল, তেমনই ভয়ও ছিল।

কিন্তু পত্রিকা দপ্তরে প্রায় নিয়মিত যাতায়াত শুরু করার কয়েকদিনের মধ্যেই ভয়টা কেটে গেল। এই অভিজ্ঞতা শুধু আমার নয়। আমার সঙ্গে নতুন যাঁরা যুক্ত হয়েছিলেন, তাঁদের সকলেরই। এর মূল কারণ পত্রিকা সম্পাদক হিসেবে প্রণবদার এবং এডিটোরিয়াল বোর্ডে সেই সময় যুক্ত ছিলেন এমন বেশ কয়েকজন অভিজ্ঞতা সমপন্ন সদস্যের ভূমিকা। বিশেষ করে বলতে হয় উৎপল সেনগুপ্ত, প্রশান্ত সরকার, প্রণব বাগচী, দীপা চট্টোপাধ্যায় ও অমর সরকারের কথা। পত্রিকার কাজ হাতে কলমে শেখানোর বিষয়ে এঁদের আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল অপরিসীম। প্রণব দা প্রথমে আমাদের বিভিন্ন কর্মসূচী বা ঘটনার রিপোর্ট লিখতে দিতেন। আর সিনিয়রদের দায়িত্ব ছিল, কিভাবে রিপোর্ট লিখতে হয়, কোন কোন বিষয়ে জোর দিতে হবে তা বুঝিয়ে দেওয়া। লেখা হয়ে গেলে সম্পাদক অর্থাৎ প্রণবদার কাছেই লেখা জমা দিতাম। প্রণবদা নিজে একবার চোখ বুলিয়ে, ভালো লাগলে প্রশংসা করতেন, আবার ঘাটতি থাকলে তাও বলে দিতেন। তবে ফাইনাল চেকআপের দায়িত্ব ছিল মূলত উৎপল দা ও প্রশান্ত দা'র। তাঁরা কনটেন্টের পাশাপাশি বানানের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। বানান ভুল হলে সংশোধন করে দিতেন। এইসব লেখালেখির বা সংশোধনীর কাজ যখন চলত, তখন আরেক প্রণবদা (বাগচী) সকলের জন্য হাতে কোনো না কোনো খাবারের ঠোঙা নিয়ে ঢুকতেন। আমাদের মনে হত বৃহত্তর কোনো পরিবারের মধ্যেই আমরা রয়েছি।

পত্রিকার শিক্ষানবীশীর দ্বিতীয় ধাপ ছিল প্রুফ সংশোধন কিভাবে করতে হয় তা শেখা। প্রুফ দেখার কাজটা যাতে আমরা ভালোভাবে করতে পারি, তার জন্য প্রণবদা অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিতব্য তাঁর লেখার প্রুফও আমাদের দেখতে দিতেন। যে কোনো কারণেই হোক, প্রণবদার দুর্বোধ্য হাতের লেখার অনেকটাই পাঠোদ্ধার আমি করতে পারতাম। সম্ভবত এই কারণেই প্রণবদার সাথে সম্পর্কটা আরও গভীর হয়। পরের দিকে প্রণবদা আমি দেখার পর আর নিজে প্রুফ দেখতেন না। আমার দেখাটাই চূড়ান্ত ধরে নিয়ে লেখাটা যেখানে পাঠানোর কথা সেখানে পাঠিয়ে দিতেন। বলতেই হয়, এই ভরসা আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করেছিল। রিপোর্টাজ থেকে আর্টিকেল বা প্রবন্ধ লেখার দায়িত্ব যখন আমাদের দেওয়া হল, তখন প্রণবদার নেতা হিসেবে আর একটা বৈশিষ্ট্য আমরা উপলব্ধি করলাম। তা হল, কোনো একটা বিষয়ে লেখার দায়িত্ব দেওয়ার পরে, কোন কোন বই থেকে আমরা সাহায্য পেতে পারি তাও বলে দিতেন। এমনকি তাঁর সংগ্রহে সেই বই থাকলে (অধিকাংশ সময় থাকত) আমাদের দিতেন। এক কথায় নেতা হিসেবে শেষ সময় পর্যন্ত গাইড করা প্রণবদার ধর্ম। যা একজন প্রকৃত নেতার বৈশিষ্ট্য বলেই আমাদের মনে হয়েছে।

আমার দু-একটি ব্যাঙ্গাত্মক (স্যাটায়ার) লেখা পছন্দ হওয়ায়, প্রণবদা সাথে উৎপলদা, প্রশান্তদা, অমরদা বার বার উৎসাহিত করতেন ব্যাঙ্গত্মক লেখার জন্য। পত্রিকার কোনো একটি সংখ্যায় প্রতিটি রিপোর্ট বা আর্টিকেলের কলাম-সেন্টিমিটার ধরে মাপ বলে দিতেন। যাতে ফাইনাল মেক-আপের সময় ম্যাটার কম না পড়ে। কিন্তু কখনও আট পাতার পত্রিকার জায়গার অভাবে কোনো লেখা ছোট করার দরকার হলে, লেখককেই সেই দায়িত্ব দিতেন। সম্পাদকের অধিকার বলে লেখককে না জানিয়ে কারও লেখাই কাট-ছাঁট করতেন না।

১০ ফেব্রুয়ারি '২৫-এ অনুষ্ঠিত স্মরণ সভায় মৌলালি যুবকেন্দ্র উপচে পড়ল ভিড়ে

একটা বিষয় আমাদের বিস্মিত করত। তা হল, প্রণবদা বহু পত্র-পত্রিকার জন্য লেখা পাঠাতেন। কিন্তু কখনও কোথাও লেখা পাঠাতে দেরি হয়েছে বলে শুনিনি। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসাও করতাম, সাংগঠনিক বহুবিধ দায়িত্বের মধ্যেও এত লেখার সময় পান কখন? প্রণবদা কিছু বলতেন না শুধু হাসতেন।

গত শতাব্দীর নব্বই-এর দশকেই প্রণবদা রাজ্য কর্মচারী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময়টা উদারীকরণ-বেসরকারীকরণ ও বিশ্বায়নের পর্ব। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রণবদার বিশ্লেষণ ধর্মী বহু লেখা আমার মতো অসংখ্য ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীকে শিক্ষিত ও পুনঃশিক্ষিত করেছে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমিয় বাগচীর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'বিশ্বায়ন ঃ ভাবনা ও দুর্ভাবনা' নামে প্রকাশিত দু'খণ্ডের একটি বইয়েও প্রণবদার লেখা স্থান পেয়েছে।

পত্রিকা সম্পাদক প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের সাথে প্রায় এক দশক কাজ করার পরে, বর্তমান শতাব্দীর গোড়া থেকে প্রণবদাকে একজন পূর্ণ সংগঠক হিসেবে দেখার সুযোগ হয়েছে। বিভিন্ন সম্মেলন, সভা-সমাবেশ, জেলা সফরে একসাথে গেছি। তখনই দেখেছি পশ্চিমবাংলার বাইরেও ত্রিপুরা ও আসাম থেকেও প্রণবদা আমন্ত্রণ পেতেন বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। এই সময়েই উপলব্ধি করেছি, সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি, মৌলিক বিষয়েও প্রণবদার বিপুল চর্চা ছিল। প্রণবদা সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন দেড় দশক (১৯৯২-২০০৭)। বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বেই এই পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা দু'লক্ষ অতিক্রম করে। প্রণবদা'র নেতৃত্বেই রাজ্যে সর্বাধিক প্রচারিত ট্রেড ইউনিয়ন মুখপত্রের স্বীকৃতি পায় সংগ্রামী হাতিয়ার। এই সময়কালে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগ্রাম, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিশেষ বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে সংগ্রামী হাতিয়ারের অনেকগুলি ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়েছে। ক্রোড়পত্রের বিষয়বস্তু নির্বাচন থেকে শুরু করে তাকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া পর্যন্ত প্রণবদা প্রকৃত নেতার মতোই দায়িত্বপ্রাপ্ত এডিটোরিয়াল বোর্ডের সদস্যদের পরামর্শ দিতেন, গাইড করতেন। পত্রিকার শুধুই গ্রাহক সংখ্যা নয়, পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধিও যে জরুরি, সে কথা বিভিন্ন সাংগঠনিক সভায় জোর দিতেন। এক কথায় সংগঠক ও প্রচারক হিসেবে ট্রেড ইউনিয়ন মুখপত্রের ভূমিকা পালনে সংগ্রামী হাতিয়ার যাতে সফল হয় সে বিষয়ে তাঁর নজর থাকত।

তবে প্রণবদা আমাদের মধ্যে না থাকলেও, একটা ছোট্ট সমালোচনা করতেই হয়। এটা তাঁকেও বলেছি। বিষয়টা হল, তাঁর ঝড়ের গতিতে বক্তৃতা শুনে নোট নেওয়া ছিল কার্যত অসম্ভব। বহুবার চেষ্টা করেও পারিনি। স্মৃতিকে যতটা সম্ভব ধরে রেখে কাজ চালাতে হয়েছে। মাঝে মাঝে মনে প্রশ্ন জাগত। লেখক প্রণব চ্যাটার্জী না বক্তা প্রণব চ্যাটার্জী কে বেশি দক্ষ? অবশ্য এই বিভাজন অনাবশ্যক। কারণ উভয়ের চালিকা শক্তিই ছিল ক্ষুরধার মস্তিষ্ক। যাকে কুর্ণিশ জানাতেই হয়। শুধু কর্মচারী আন্দোলনের বৃত্তে থাকা তাঁর সহযোদ্ধারাই নন, সুলেখক ও বাগ্মী প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা-কর্মীরাও ঋণী থাকবেন।

জীবনের শেষ দুটি বছর, প্রায় নীরব ও লেখনীবিহীন প্রণবদার জন্য খুব কষ্ট হত। প্রায়শই মনে হত, প্রণবদা যদি সচল থাকতেন, তাহলে হিন্দুত্ববাদী ও কর্পোরেট শক্তির অশুভ আঁতাতের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠ ও লেখনী কিভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করত। ভাবতাম, আর এই ভেবে অপেক্ষা করতাম যে প্রণবদা নিশ্চয়ই একদিন সুস্থ হয়ে উঠে আবার স্বভূমিকায় আন্দোলনের ময়দানে অবতীর্ণ হবেন। কিন্তু ২৪ জানুয়ারি সন্ধ্যার পরে এই অপেক্ষারও অবসান হল। □

সুমিত ভট্টাচার্য

Editor : MANAS KUMAR BARUA
SANGRAMI HATIAR
State Co-ordination Committee
52nd Year, 7th & 8th Edition, November-December, 2024
Regd. No. : 18484/71

কমরেড প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণ সভা

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং পশ্চিমবঙ্গ সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস এসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

মৌলালী যুবকেন্দ্রে আয়োজিত হয় রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতৃত্ব তথা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ারের প্রাক্তন সম্পাদক কমরেড প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণসভা। তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান দুই সংগঠনের বর্তমান ও প্রাক্তন নেতৃবৃন্দ। মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয় তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে। মাল্যদান পর্বটি পরিচালনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক দেবব্রত রায়। এছাড়াও সকল স্তরের কর্মী, নেতৃত্ব যাতে প্রিয় নেতার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ জানাতে পারেন সেজন্য প্রেক্ষাগৃহের প্রবেশপথে তাঁর প্রতিকৃতি রাখা হয়। স্মরণসভায় শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি মানস দাস।

স্মরণ সভায় পশ্চিমবঙ্গ সাব অর্ডিনেট ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস এসোশিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মণিশঙ্কর মণ্ডল স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেন যে কমরেড প্রণব চট্টোপাধ্যায় অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। ষাটের দশকের শেষপ্রান্তে এসে তিনি চাকরীতে যোগদান করেছিলেন এবং সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ১৯৮১ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত সমিতির যুগ্ম-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিভিন্ন স্তরে দায়িত্ব পালন করেন। ২০২২ সালে সমিতির মুখপত্র সংযোগ পত্রিকার পঞ্চাশ বছর পূর্তির অনুষ্ঠানে তিনি শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও উপস্থিত হয়েছিলেন। বাজেট নিয়ে ওনার বিশ্লেষণের দিকে তাকিয়ে থাকতো নেতৃত্ব থেকে সাধারণ কর্মচারী।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে বলেন যে শুধুমাত্র রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের মধ্যেই

প্রবীর মুখার্জী

কমরেড প্রণব চট্টোপাধ্যের অস্তিত্ব সীমাবদ্ধ ছিল না, এই গণ্ডী বা বৃত্তের বাইরেও গণ আন্দোলন, সামাজিক আন্দোলনের বৃহত্তর পরিসরেও তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল। কমরেড চট্টোপাধ্যায় তাঁর গভীর মনন আর বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই একজন বামপন্থী চিন্তাধারার সুদক্ষ লেখক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলন বা সংগঠন চিন্তা, চেতনা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতায় কিছুটা এগিয়ে থাকা মানুষের সমন্বয়ে গঠিত, তাই মেধাগত শ্রমই এই কর্মক্ষেত্রের প্রধানতম উপাদান। তবে কায়িক শ্রমও নগণ্য নয়। অধিকাংশ কর্মচারীই উৎপাদনধর্মী কাজের সাথে যুক্ত নন। মূলত তাঁরা কর্মক্ষেত্রে পরিষেবা প্রদানকারী কাজের সাথে যুক্ত থাকেন। কমরেড প্রণব চট্টোপাধ্যায় যেমন

একদিকে সুবাগ্মী ছিলেন, তেমনই সুলেখক হিসেবেও তিনি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তিনি তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে কর্মচারী আন্দোলনই শুধু নয়, শ্রেণী আন্দোলনকেও সমৃদ্ধ করেছিলেন।

স্মরণসভায় কমরেড প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় সমিতি (এইচ বি রোড)-এর সাধারণ সম্পাদক মহুয়া রায় বলেন ত্রিপুরার শিক্ষক-কর্মচারী আন্দোলনের সাথে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক-কর্মচারী আন্দোলনের ওতপ্রোত যোগাযোগ

মহুয়া রায়

ষাট-সত্তরের দশক থেকেই রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্মেলনে এরাজ্যের কর্মচারী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থেকে বক্তব্য রেখেছেন। কমরেড প্রণব চট্টোপাধ্যায়ও ২০০০ সালে ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী পরিষদের ৪৫তম সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্যের মাধ্যমে ত্রিপুরার শিক্ষক-কর্মচারীদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। কমরেড

মানস দাস

চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ত্রিপুরায় সংগ্রামী হাতিয়ারের গ্রাহক সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। তাঁর সময়োপযোগী, তথ্যনির্ভর বক্তব্য কর্মচারী আন্দোলনের কর্মীদের চেতনার মান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ত্রিপুরার রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরেও তিনি ২০১৯ সালে ত্রিপুরায় গিয়েছেন। তিনি ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গের কর্মচারী সংগঠনগুলির কর্মী, নেতৃত্বদের একটা অখণ্ড পরিবার বলে মনে করতেন।

কমরেড প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর ভ্রাতা শ্রী অনুপ চট্টোপাধ্যায় কমরেড চট্টোপাধ্যায়ের শৈশব, ছাত্রজীবন, পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। ছাত্রজীবনেই তিনি বামপন্থায় আকৃষ্ট হন এবং আমৃত্যু তিনি এই মতাতর্শের প্রতি অবিচল ছিলেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর মধ্যে নেতৃত্ব প্রদান করার সহজাত ক্ষমতা ছিল। পরিবার-পরিজনদের মধ্যেও তাঁর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। মতাদর্শের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই ১৯৭৮ সালে তিনি পরিবারের জমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বর্গা লিখিয়েছিলেন।

স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের অন্যতম প্রবীণ নেতৃত্ব প্রবীর মুখার্জী। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন যে কমরেড প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের মতো একজন দক্ষ সংগঠক, সুলেখক, সুবাগ্মী, যিনি সারাজীবন ধরে কর্মচারী আন্দোলনের স্বার্থে কাজ করে গিয়েছেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর যে প্রাপ্য সম্মান তা আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে দিতে পারিনি। এই আক্ষেপ, এই বেদনা চিরকাল থেকে যাবে। তিনি কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ করা কবি নাজিম হিকমতের কবিতা উদ্ধৃত করে বলেন যে বিংশ শতাব্দীতে, মানুষের শোকের আয়ু বড়জোর এক বছর। কিন্তু কোনও কোনও মৃত্যু আমাদের ভাবায়, কাঁদায়, হৃদয়কে রক্তাক্ত করে। কমরেড

মণিশংকর মণ্ডল

মাও সে তুং বলেছিলেন কোনও কোনও মৃত্যু পাহাড়ের চেয়েও ভারী। কমরেড প্রণব চট্টোপাধ্যের মৃত্যু তেমনই। আমরা স্মরণ সভা শুধু ভাল ভাল কথা বলবার জন্য করি না। স্মরণ সভা করা হয় তাঁর জীবনের ইতিবাচক দিকগুলিকে সামনে নিয়ে আসার জন্য, তাকে সংগঠনের কাজে লাগানোর জন্য। কমরেড চট্টোপাধ্যায় বলতেন যে সম্মেলনে যে প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকেন, প্রস্থানের সময় তাঁদের কারও ওজন বৃদ্ধি হবে না, উচ্চতা

অনুপ চট্টোপাধ্যায়

বৃদ্ধি হবে না, কিন্তু চেতনার বৃদ্ধি ঘটবে। এই চেতনার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যেই কমরেড চট্টোপাধ্যায় চিরকাল কাজ করে গেছেন, তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে, তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। এক শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার স্বপ্ন নিয়েই তিনি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, কর্মচারী আন্দোলন পরিচালনা করে গেছেন। চেতনায় শাণ দিয়ে, মগজাস্ত্রকে ব্যবহার করে, মেরুদণ্ড সোজা রেখে, মতাদর্শে পুষ্ট হয়ে আমাদের কমরেড প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের দেখানো পথ ধরে হেঁটেই তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার চেষ্টা করতে হবে।

স্মরণ সভায় পরিবারের পক্ষ থেকে কমরেড প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের ভাই ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তাঁর দুই পুত্রবধূ। সমগ্র স্মরণসভাটি পরিচালনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি মানস দাস এবং পশ্চিমবঙ্গ সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস এসোসিয়েশনের অন্যতম সহ-সভাপতি সুজয় বক্সী। ইন্টার ন্যাশনাল সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘটানো হয়। □

দীপঙ্কর বাগচী

আলোচনাসভা

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, পূর্ব বর্ধমান জেলা শাখার উদ্যোগে বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় সংগঠনকে শক্তিশালী করতে এবং কর্মী নেতৃত্বের চেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি বর্ধমান কর্মচারী ভবনে, তিনটি বিষয়ের উপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছায়া মণ্ডল, উদয়ন নিয়োগী ও অনাথ বন্ধু মণ্ডলকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী আলোচনা সভার কাজ পরিচালনা করেন। ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রসঙ্গে আলোচনায় জেলা সম্পাদক বিদ্যুত দাস বলেন ক্রিপ্টোকারেন্সি হলো পুঁজিবাদী লুটের নবতম কৌশল। শ্রমজীবীদের এই প্রসঙ্গে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

এক দেশ এক ভোট প্রসঙ্গে আলোচনায় জেলার যুগ্ম সম্পাদক দেব কুমার দত্ত বলেন, এক দেশ এক ভোটের লক্ষ্য হলো সংবিধানের মর্মবস্তুকে ধ্বংস করা এবং কার্যত এক দেশ এক ধর্ম, এক জাতি, এক নেতা, এক ভাষা কায়েম করে আমাদের দেশের বহুত্ববাদকে ধ্বংস করা।

বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিপদ প্রসঙ্গে আলোচনায় জেলা সভাপতি ছায়া মণ্ডল বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার হতে হবে, পাশাপাশি আমাদের রাজ্যে দুটি রাজনৈতিক দলের প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেও আমাদের সংগঠনের সদস্যদের সতর্ক করতে হবে। সভায় সংগঠনের শতাধিক কর্মী নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। □

মহাত্মা গান্ধীর ৭৮তম প্রয়াণ দিবসে সম্প্রীতির মহামিছিল

গত ৩০ জানুয়ারি, ২০২৫ মহাত্মা গান্ধীর ৭৮তম প্রয়াণ দিবসে ১২ই জুলাই কমিটির পক্ষ থেকে সম্প্রীতির মহামিছিলের আহ্বান জানানো হয়। ওইদিন বিকেলে বেলেঘাটা গান্ধী ভবন থেকে শিয়ালদহ স্টেশন পর্যন্ত মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিল শুরুর আগে বেলেঘাটা গান্ধী ভবনে অবস্থিত গান্ধীজীর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। মাল্যদান করেন ১২ই জুলাই কমিটির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং সহযোগী সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দ। মাল্যদানের আগে ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম-আহ্বায়ক সুমিত ভট্টাচার্য সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি দেশবাসীর ঐক্য, সংহতি ও সম্প্রীতি রক্ষায় গান্ধীজীর মহান ভূমিকার কথা উল্লেখ করে গান্ধীজীর ৭৮তম প্রয়াণ দিবসের প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। মাল্যদান কর্মসূচী সমাপ্ত হওয়ার পরেই মিছিল শুরু হয়। ১২ই জুলাই কমিটির আওতাভুক্ত বিভিন্ন সংগঠনের কর্মী ও নেতৃত্ব এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। মিছিলটি গান্ধী ভবন থেকে শুরু হয়ে বেলেঘাটা মেন রোড ধরে এগোতে থাকে। শিয়ালদহ বিগবাজারের উল্টোদিকে পৌঁছে মিছিলটি শেষ হয়। সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত সভাও অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সুমিত ভট্টাচার্য। □

সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
সহযোগী সম্পাদক ঃ সুমন কান্তি নাগ
যোগাযোগ ঃ
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত।